সত্যজিৎ রায়
যখন
ছোট
ছিলাম

যখন ছোট ছিলাম

এই বইতেই তিনি শুনিয়েছেন একটি ছেলের কথা, ইস্কুল ছাড়ার দশ বছর বাদে যাঁকে একবার যেতে হয়েছিল পুরনো ইস্কুলের চত্বরে, আর যেখানে ঢুকেই যাঁর মনে হয়েছিল, এ কোথায় এলাম রে বাবা! দরজা ছোট, বারান্দা ছোট, ক্লাসরুম আর ক্লাসের বেঞ্চিগুলো— সবই কেমন ছোট মনে হচ্ছে। পরে তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, কেন এই বিভ্রম। ইস্কুল ছাড়ার সময় তিনি ছিলেন পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর সেবার যখন ফিরে গেলেন, তখন তিনি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। ইস্কুল তো বাড়েনি, বেড়েছেন তিনি নিজেই। আমরা অবশ্য জানি, এর পরেও ক্রমশ তিনি আরও কত বড় মাপের হয়ে উঠেছেন। প্রতিভায়, প্রতিপত্তিতে, খ্যাতিতে, জনপ্রিয়তায়— ক্রমশই তিনি নিজেকে কীভাবে গিয়েছেন ছাপিয়ে। সেই বড় মাপের মানুষটিই এই বইতে শোনালেন তাঁর খুব পুরনো দিনের কিছু কথা— 'যখন ছোট ছিলাম'। একদা যিনি আমাদের চলচ্চিত্রকে রাতারাতি সাবালক করে তুলেছিলেন 'পথের পাঁচালী' উপহার দিয়ে, আজ তিনি নতুন করে যেন শুরু করলেন আরেক পথের পাঁচালী, যে-পথ গিয়েছে তাঁর নিজেরই সোনালী শৈশবের দিকে। এই নতুন পথের পাঁচালীতেও একটি ছেলের মুগ্ধতা ও বিস্ময়, কল্পনা ও কৌতূহল, কৌতুক ও রোমাঞ্চ, অনুভব ও উপলব্ধি নিয়ে বড় হয়ে ওঠা ছবির মতন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। সেই ছেলেটির নাম— সত্যজিৎ রায়। এ-বইতে শুধু সেই ছোট্ট সত্যজিৎ রায়ের বড় হয়ে ওঠার কাহিনীই শোনাননি তিনি, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন এমন-এক পরিবারের কথা যে-পরিবার বাংলা সাহিত্যে একমাত্র ঠাকুরবাড়ির পরেই স্মরণযোগ্য। আর শুনিয়েছেন এমন-এক কলকাতার কথা, যে-কলকাতা আজ মনে হয় অচেনা।

(শেষাংশ পরবর্তী ফ্ল্যাপে)

ISBN 81-7066-880-8

স্মৃতিকে সবাই ধরে রাখতে পারে না, সবাই পারে না স্মৃতিপটে ফুটে-ওঠা কাহিনীকে সরস ও স্বাদু করে শোনাতে। সত্যজিৎ রায় এই দুটো কঠিন কাজই খুব সহজ করে আর সুন্দর করে পেরেছেন। তাঁর স্মৃতি-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি যেমন মণিমুক্তোয় ঠাসা, বলার ভঙ্গিতেও তেমনই হীরের ধার এবং উজ্জ্বলতা।
'যখন ছোট ছিলাম' বেরিয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার দুটি সংখ্যায়। বর্তমান গ্রন্থটিকে তার পুনর্মুদ্রণ বললে নিতান্তই কমিয়ে বলা হবে। লেখা যেমন আমূল বদলে গেছে সম্পাদনায় আর সংযোজনে, ছবির ক্ষেত্রেও তেমনই বহু বদল, যোজনা এবং সংস্কার। নতুন করে বিস্তর ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায় এ-বইয়ের জন্য। যেমন, গড়পারের বাড়ি অথবা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল। নতুন করে যেতে হয়েছে তাঁকে এ-সব জায়গায়, স্কেচ আঁকার জন্য। গ্রন্থাকারে 'যখন ছোট ছিলাম'-এর আরেকটি বড় আকর্ষণ, পাতার পর পাতা জোড়া বহু দুষ্প্রাপ্য ফোটো এবং ফ্যাকসিমিলি। আরও যা থাকছে, তা হল একটি পরিচয়লিপি যেখানে এই স্মৃতিকথায় বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের পুরো নাম বর্ণিত।

প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়

যখন ছোট ছিলাম

ছেলেবেলার কোন্ ঘটনা মনে থাকবে আর কোন্‌টা যে চিরকালের মতো মন থেকে মুছে যাবে সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। মনে থাকা আর না-থাকা জিনিসটা কোনো নিয়ম মেনে চলে না। স্মৃতির রহস্য এখানেই। পাঁচ বছর বয়সে আমি চিরকালের মতো আমার জন্মস্থান গড়পার রোডের বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে চলে আসি। এই পুরোনো বাড়ি থেকে নতুন বাড়ি চলে আসার দিনটা আমি বেমালুম ভুলে গেছি, কিন্তু গড়পারে থাকতে আমাদের রাঁধুনী বামনীর ছেলে হরেনের বিষয় একটা খুব সাধারণ স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

আমার এই স্মৃতিকথায় তাই অনেক সামান্য ঘটনার কথা আছে, যেমন আছে কিছু নামকরা লোকের পাশে-পাশে অনেক সাধারণ লোকের কথা। সাধারণ-অসাধারণের প্রভেদ বড়দের মতো করে ছোটরা করে না; তাই তাদের মেলামেশার কোনো বাছবিচার থাকে না। এ ব্যাপারে গুরুজনের বিচার যে ছোটরা সব সময় বোঝে বা মানে তাও নয়।

এই স্মৃতিকথা প্রথম বেরোয় সন্দেশ মাসিক পত্রিকার দুই সংখ্যায়। তারপরে আরো কিছু ঘটনা ও মানুষের কথা মনে পড়ায় এই বইয়ে তাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল।

১০০ নং গড়পার রোড
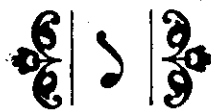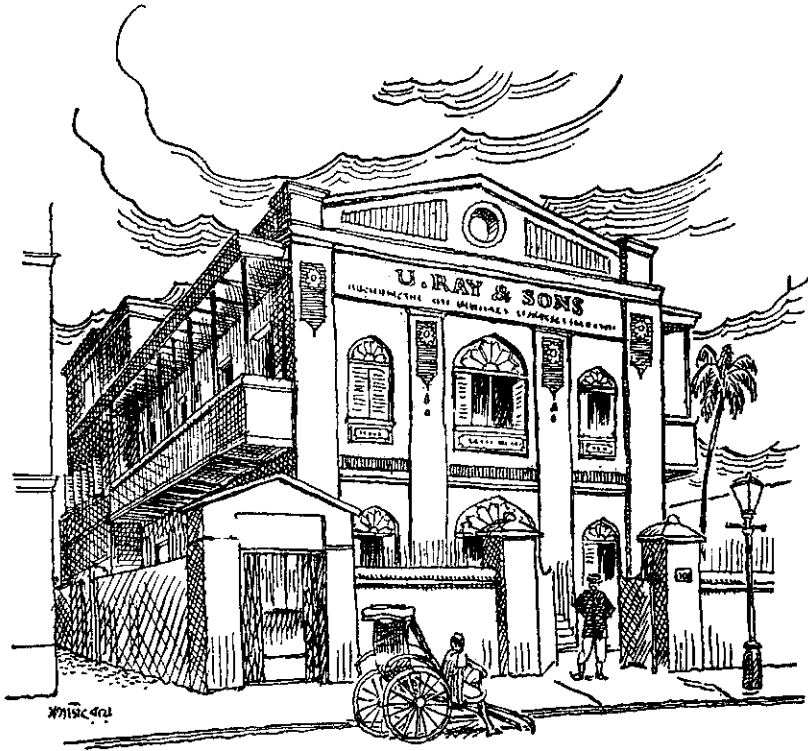
গড়পার

আমাদের ছেলেবেলায় এমন অনেক কিছু ছিল যা এখন আর নেই। বাড়ির বারান্দার রেলিং থেকে To Let লেখা বোর্ড ঝুলতে এখন আর কেউ দেখে কি? তখন পাড়ায় পাড়ায় দেখা যেত। ছেলেবেলায় দেখেছি ওয়াল-ফোর্ড কোম্পানির লাল ডবল ডেকার বাসের ওপরে ছাত নেই। সে বাসের দোতলায় চড়ে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়ার একটা আলাদা মজা ছিল। রাস্তাঘাট তখন অনেক নিরিবিলি ছিল, ট্র্যাফিক জ্যামের বিভীষিকা ছিল না বললেই চলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় তফাত ছিল মোটর গাড়ির চেহারায়। কত দেশের কত রকম মোটরগাড়ি যে চলত কলকাতা শহরে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব গাড়ির প্রত্যেকটার চেহারা এবং হর্নের আওয়াজ আলাদা। ঘরে বসে হর্ন শুনে গাড়ি চেনা যেত। ফোর্ড শেভ হাম্বার ভক্সহল উল্‌স্‌লি ডজ ব্যুইক অস্টিন স্টুডিবেকার মরিস ওল্‌ডসমোবিল ওপ্যাল সিত্রোয়াঁ—এসব গাড়ি এখন শহর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হুড খোলা গাড়ি ক'টা দেখা যায়? খুদে গাড়ি বেবি অস্টিন কালেভদ্রে এক-আধটা চোখে পড়ে। আর সাপের মুখওয়ালা 'বোয়া হর্ন' লাগানো বিশাল ল্যানসিয়া, লাসাল—এসব আমীরী গাড়ি ত মনে হয় স্বপ্নে দেখা। কচ্ছপের খোলের মতো দেখতে প্রথম স্ট্রীমলাইন্‌ড গাড়ি যখন কলকাতায় এলো, সেও ত প্রায় এক যুগ আগে। আর ঘোড়ার গাড়ি জিনিসটাও প্রায় দেখাই যায় না। আমাদের গড়পারের বাড়িতে মোটরগাড়ি ছিল না, তাই ঘোড়ার গাড়িতে আমরা অনেক চড়েছি। বাক্সগাড়িতে আরাম কোনদিনই ছিল না, তবে ফীটনে চড়ে বেশ মজা লাগত এটা মনে আছে।

আজকাল আকাশ কাঁপিয়ে জেট প্লেন যাতায়াত করে শহরের উপর দিয়ে। তখন এ শব্দটা ছিল মানুষের অচেনা। দুটো একটা টু সীটার প্লেন আকাশে দেখা যেত মাঝে মধ্যে। তখন দমদম আর বেহালায় ফ্লাইং ক্লাব চালু হয়েছে, বাঙালীরা প্লেন চালাতে শিখছে। এই সব প্লেন থেকে

মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের কাগজ ফেলা হত। হাজার হাজার কাগজ এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে সেগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শহরের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। একবার খানকতক পড়ল আমাদের বকুলবাগানের বাড়ির ছাতে; তুলে দেখি বাটার বিজ্ঞাপন।

দৈনিক ব্যবহারের জিনিস, ওষুধপত্র ইত্যাদি যে কত বদলেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নাইলনের আগের যুগের সাদা রঙের কলিনোজ টুথব্রাশ আজকাল আর কেউ ব্যবহার করে না। আমরা তাই করতাম, আর সেই সঙ্গে কলিনোজ টুথপেস্ট। কালো রঙের Swan আর Waterman ফাউণ্টেন পেন যা দিয়ে তৈরি হত তাকে বলত Gutta Percha। পুড়লে বিশ্রী গন্ধ বেরোত। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে সেসব কলম আজকের দিনের কলমের চেয়ে ঢের বেশি টেকসই ছিল।

কোয়ালিটি-ফ্যারিনির যুগে বাড়িতে Freezer দিয়ে আসইক্রীম আর কে তৈরি করে? আমাদের ছেলেবেলায় কাঠের বালতির গায়ে লাগানো লোহার হাতলের ঘড় ঘড় শব্দ শুনলে মনটা নেচে উঠত। কারণ বাড়ির তৈরি ভ্যানিলা আইসক্রীমের স্বাদের সঙ্গে কোনো ঠেলাগাড়ির আইসক্রীমের স্বাদের তুলনা চলে না।

মনে আছে ছেলেবেলায় অসুখ করলে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন, আর সেই প্রেসক্রিপশন দেখে মিক্সচারের শিশি দিয়ে দিত ডাক্তারখানা থেকে। সবচেয়ে মজা লাগত শিশির গায়ে আঠা দিয়ে লাগানো দাগ কাটা কাগজের ফিতে। এ জিনিস আজকাল প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। সেকালে সর্দি হলে ফুট বাথ নিতে হত। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গামলায় গরম জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হত। তাতে সর্দি সারত কিনা সেটা অবিশ্যি মনে নেই। জোলাপের জন্য তখন খেতে হত Castor Oil —যার স্বাদে গন্ধে নাড়ীভুঁড়ি উলটে আসত। ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনীনের বড়ি ছাড়া গতি ছিল না। আমি আবার বড়ি গিলতে পারতাম না। একবার ঢাকা যাবো, সেখানে ম্যালেরিয়া, কুইনীন খেতে হবে। চিবিয়ে খেয়েছিলাম সেই বড়ি। তার বিষ তেতো স্বাদ এখনো যেন যায়নি মুখ থেকে। ক্যাপসুল আসার পর থেকে ওষুধ জিনিসটা যে বিস্বাদ হতে পারে সেটা ভুলে গেছি আমরা।

একেবারে শিশু বয়সের কথা মানুষের খুব বেশি দিন মনে থাকে না।

আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স আড়াই বছর। সে ঘটনা আমার মনে নেই। কিন্তু বাবা যখন অসুস্থ, আর আমার বয়স দুই কিম্বা তারও কম, তখনকার দুটো ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

বাবা অসুখে পড়েন আমি জন্মাবার কিছুদিনের মধ্যেই। এ অসুখ আর সারেনি, তবে মাঝে মাঝে একটু সুস্থ বোধ করলে বাবাকে বাইরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হত। বাবার সঙ্গেই আমি গিয়েছিলাম একবার সোদপুর আর একবার গিরিডি। গঙ্গার উপর সোদপুরের বাড়ির উঠোনটা মনে আছে। একদিন বাবা ছবি আঁকছেন ঘরে জানালার ধারে বসে, এমন সময় হঠাৎ বললেন, 'জাহাজ যাচ্ছে'। আমি দৌড়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে দেখলাম ভোঁ বাজিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল।

গিরিডির ঘটনায় বাবা নেই; আছে আমাদের বুড়ো চাকর প্রয়াগ। আমি আর প্রয়াগ সন্ধ্যাবেলা উশ্রীর ধারে বালিতে বসে আছি। প্রয়াগ বলল, বালি খুঁড়লে জল বেরোয়। আমি ভীষণ উৎসাহে বালি খুঁড়তে শুরু করলাম। খোঁড়ার জন্য খেলনার দোকানে কেনা কাঠের খোন্তা ছিল, সেটাও মনে আছে। খোঁড়ার ফলে জল বেরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সময় কোত্থেকে একটা দেহাতি মেয়ে এসে সেই জলে হাত ধুয়ে গেল। যে জল আমরা খুঁড়ে বার করেছি তাতে অন্য লোক এসে হাত ধুয়ে যাবে এটা ভেবে একটু রাগ হয়েছিল, তাও মনে আছে।

যে বাড়িতে আমার জন্ম, সেই একশো নম্বর গড়পার রোডে আমি ছিলাম আমার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর অনেক বাড়িতে থেকেছি, আর সবই দক্ষিণ কলকাতায়; কিন্তু গড়পার রোডের মতো এমন একটা অদ্ভুত বাড়িতে আর কখনো থাকিনি।

শুধু ত বাড়ি নয়, বাড়ির সঙ্গে আবার ছাপাখানা। ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর নিজে নকশা করে বাড়িটা তৈরি করে তাতে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র বছর চারেক। তিনি মারা যান আমার জন্মের সাড়ে পাঁচ বছর আগে। বাড়ির সামনের দেয়ালে উপর দিকে উঁচু উঁচু ইংরিজি হরফে লেখা ছিল 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স, প্রিণ্টার্স অ্যান্ড ব্লক মেকার্স।' গেট দিয়ে ঢুকে দারোয়ান হনুমান মিসিরের ঘর পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে ছিল ছাপাখানার আপিসে ঢোকার বিরাট দরজা। এক তলায় সামনের দিকটায় ছাপাখানা, আর তার ঠিক উপরে দোতলায় ছিল ব্লক তৈরি আর হরফ বসানোর ঘর। আমরা থাকতাম বাড়ির পিছন দিকটায়। বাঁয়ে গলি দিয়ে গিয়ে ডাইনে পড়ত বসতবাড়িতে ঢোকার দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকেই সিঁড়ি। আত্মীয়স্বজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাইনে ঘুরতেন, আর ছাপার কাজের ব্যাপারে যাঁরা আসতেন তাঁরা ঘুরতেন বাঁয়ে। বাঁয়ে ঘুরে ব্লক-মেকিং ডিপার্টমেণ্টের দরজা, আর ডাইনে ঘুরে আমাদের বৈঠকখানার দরজা।

আমাদের বাড়ির গায়ে পশ্চিম দিকে ছিল মূক-বধির বিদ্যালয়, আর পুবে—আমাদের বাগানের পাঁচিলের উল্টোদিকে—ছিল এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশন। দুপুরটা যখন গাড়ির চলাচল থেমে গিয়ে হয়ে যেত থমথমে নিস্তব্ধ, তখন এথিনিয়াম ইস্কুল থেকে শোনা যেত ছাত্রদের নামতা পড়া আর বই থেকে রীডিং পড়া, আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে মাস্টারদের ধমকানি। বিকেলে মূক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের মাঠে খেলা করত, সে খেলা আমরা ছাদ থেকে দেখতে পেতাম। তবে আসল দেখার ব্যাপার হত বছরে একবার, স্কুলের অ্যানুয়েল স্পোর্টসের দিন।

আমাদের এই ছাতটা ছিল তিন তলায়, ঠিক ছাপাখানার উপরে। এখানেই হত আমাদের চোর-চোর খেলা আর ঘুড়ি ওড়ানো। বড় ছাত ছাড়াও আরেকটা ছোট ছাত ছিল পশ্চিম দিকে। ঠাকুরদাদার কাজের ঘর, যেটা আমি জন্ম থেকে খালিই দেখেছি, সেটাও ছিল এই তিন তলায়। এই ঘরের একটা জিনিস পরে আমার হয়ে গিয়েছিল, সেটা হল একটা কাঠের বাক্স। এই বাক্সে থাকত ঠাকুরদাদার রঙ, তুলি আর তেল-রঙের কাজে ব্যবহারের জন্য লিনসীড অয়েলের শিশি।

তিনতলার দক্ষিণের ঘরে থাকতেন আমার মেজোকাকা বা কাকামণি—

সুবিনয় রায়। বাবা মারা যাবার পরে ছাপাখানার তদারক কাকামণিই করতেন। জার্মানি থেকে তখন নানারকম কাগজের নমুনার বই আসত আমাদের অফিসে। মোটা, পাতলা, রেশমী, খসখসে, চক্‌চকে, এবড়ো-খেবড়ো, কতরকম যে কাগজ তার ঠিক নেই। কাকামণির ঘরে গেলে তিনি আমার হাতে ওই রকম একটা বই দিয়ে বলতেন—দেখ ত এর মধ্যে কোনটা চলবে। আমি বিজ্ঞের মতো পর পর কাগজের উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চলবে কি চলবে না বলে দিতাম। আমার ধারণা ছিল আমার বাছাই করা কাগজই আসবে জার্মানি থেকে।

কাকামণির ছেলে সরল ছিল আমার একমাত্র আপন খুড়তুতো দাদা। তবে দাদা আর কাকীমা অনেক সময়ই থাকতেন কাকার শ্বশুরবাড়ি জব্বলপুরে। দাদার পড়াশুনা হয়েছিল সেখানেই, সাহেব ইস্কুলে। দাদার ভালো নাম ছিল সরল। ইস্কুলে সাহেবের ছেলেরা দাদাকে ডাকত সিরিল (Cyril) বলে।

তিনতলাতেই আরেকটা ঘরে থাকতেন আমার ছোটকাকা সুবিমল রায়। পরে ছোটকাকার সংগ পেয়েছি অনেক; গড়পারে তাঁর সম্বন্ধে যে কথাটা মনে আছে সেটা হল এই যে ছোটকাকার ভাত খেতে সময় লাগত আমাদের চেয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা বেশি। কারণ তাঁর নিয়ম ছিল প্রতিটি গ্রাস বত্রিশ বার করে চিবোনো। এ না করলে নাকি খাদ্য ঠিক হজম হয় না।

আমি আর মা থাকতাম দোতলায় দক্ষিণে, কাকামণির ঘরের ঠিক নিচের ঘরে। পশ্চিমের একটা ঘরে থাকতেন বিধবা ঠাকুমা, যাঁর সঙ্গে আমার অনেকটা সময় কেটেছে ঝুড়ি থেকে পুরোন সন্দেশের ছবির ব্লক বাছাই করে ঝেড়ে পুঁছে আলাদা করে রাখতে। ঠাকুমা মারা যান আমি গড়পারে থাকতে-থাকতেই।

গড়পারে সব চেয়ে বেশি মনে আছে আমার ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায়কে। উনি থাকতেন একতলায় আমাদের শোবার ঘরের ঠিক নিচের ঘরে। দাদু মুগুর ভাঁজতেন, দাদু মৃত লোকের ছবি এনলার্জ করতেন, দাদু আমাকে পুরাণের গল্প বলতেন, আর দাদু এককালে ক্রিকেট খেলতেন। জাঁদরেল সাহেব-টীম ক্যালকাটার বিরুদ্ধে বাঙালী টীম টাউন ক্লাবের হয়ে দাদু একবার নিরানব্বুইয়ের গাঁটে আটকে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে সেঞ্চুরি করেছিলেন, সে গল্প তাঁর কাছে অনেকবার শুনেছি। আমি যখন দাদুকে দেখেছি তখন তাঁর আর খেলার বয়স নেই। কিন্তু খেলা দেখার উৎসাহ

তাঁর জীবনের শেষ অবধি ছিল। এম. সি. সি., অস্ট্রেলিয়ার দল কলকাতায় এলে দাদুর মন পড়ে থাকত ইডেনের মাঠে।

দাদুর পেশা ছিল ছবি এনলার্জ করা। ছোট থেকে বড় করা ছবি ফিনিশ করার কাজটা তাঁর নিজের ঘরেই করতেন তিনি। তেল রঙে ছবি আঁকার জন্য যেমন ইজেল থাকে, তেমনি ইজেলে এনলার্জ করা ছবি খাড়া করে রেখে পা দিয়ে একটা হাপরের মতো জিনিস দাবিয়ে হাতে ধরা এয়ার-ব্রাশের সরু মুখ দিয়ে রঙের স্প্রে বার করে ফিনিশ করার কাজ চলত, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বেশির ভাগ ছবিই হত কালচে বা খয়েরি রঙে, কিন্তু একবার মনে আছে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণের ছবি ফিনিশ করছেন রং দিয়ে, গাছপালায় সবুজ, কাশ্মিরী শালের গায়ে লাল। পাশে বসে নতুন মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ দাদুর কাজ দেখছেন এটাও মনে আছে।

চেনাশোনা বাড়িতে কেউ মারা গেলেই দাদুর কাছে অর্ডার আসত ছবি এনলার্জ করার জন্য। হয়ত গ্রুপ ফোটোতে ছোট্ট একটা মুখ, তাও খুব স্পষ্ট নয়, সেটাই যখন দাদুর হাতে বড় হয়ে ফিনিশ হয়ে বাঁধিয়ে আসত, তখন মনে হত আসল মানুষটা যেন ছবি থেকে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। কেউ মারা যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দাদুকে দেখা যেত বগলে ব্রাউন পেপারে মোড়া বাঁধানো ছবি নিয়ে এসে হাজির। সে ছবি খুলে সকলের সামনে টেবিলের উপর দাঁড় করানো হত, আর ছবির দিকে চেয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা চোখের জল মুছতেন। এ দৃশ্য ছেলেবেলায় আমার নিজের চোখে দেখা অনেকবার।

গড়পারে থাকতেই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স থেকে দাদুর লেখা অনেক ছোটদের বই বেরিয়ে গিয়েছিল—ইলিয়াড, ওডিসিউস, পুরাণের গল্প, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন, কথা সরিৎসাগর। এইসব বই ডাঁই করে রাখা থাকত ছাপাখানার দোতলায় একটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মধ্যে। এর অনেক গল্পই অবিশ্যি আগে সন্দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

বাবা মারা যাবার দু'বছর পর অবধি সন্দেশ পত্রিকা বেরিয়েছিল। একতলার ছাপাখানায় সন্দেশ ছাপা হচ্ছে, তার তিন রঙের মলাট ছাপা হচ্ছে, একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। ছাপাখানায় ঢু মারার সময়টা ছিল দুপুর বেলা। দোতলাতেই যাওয়া হত বেশি। ঢুকলেই দেখা যেত ডাইনে সারি সারি কম্পোজিটারের দল তাদের খোপ কাটা হরফের বাক্সের

উপর ঝুঁকে পড়ে হরফ বেছে বেছে পর পর বসিয়ে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে লাইন তৈরী করছেন। সকলেরই মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল, ঘরে ঢুকলে সকলেই আমার দিকে চেয়ে হাসতেন। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম ঘরের পিছন দিকে। আজও তারপিন তেলের গন্ধ পেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের ব্লক মেকিং ডিপার্টমেণ্টের ছবি। ঘরের মাঝখানে রাখা বিরাট প্রোসেস ক্যামেরা। ক্যামেরার কাজ যে শিখে নিয়েছিল বেশ পাকা ভাবে, সেই রামদহিন প্রেসে যোগ দিয়েছিল সামান্য বেয়ারা হিসাবে। বিহারের ছেলে। ঠাকুরদা নিজে হাতে তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। রামদহিন ছিল প্রায় ঘরের লোকের মতো, আর তার কাছেই ছিল আমার যত আবদার। একটা কাগজে হিজিবিজি কিছু এঁকে নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিয়ে বলতাম, 'রামদহিন, এটা সন্দেশে বেরোবে'। রামদহিন তক্ষুনি মাথা নেড়ে বলে দিত, 'হাঁ খোখাবাবু, হাঁ'। শুধু তাই না; আমার ছবি ক্যামেরার নিচের দিকে মুখ করা লেন্সের তলায় বিছিয়ে রেখে আমাকে কোলে তুলে ক্যামেরার পিছনের ঘষা কাঁচে দেখিয়ে দিত সে ছবির উল্টো ছায়া।

পড়াশুনা গড়পারে কী করেছি তা ঠিক মনে পড়ে না। একটা আবছা স্মৃতি আছে যে ধনদাদুর মেয়ে বুলুপিসি আমাকে ইংরিজি প্রথম ভাগ পড়াচ্ছেন। বইয়ের নাম ছিল Step by Step। সেটার চেহারাও মনে পড়ে। মা-ও পড়াতেন নিশ্চয়ই, তবে যেটা মনে পড়ে সেটা হল তিনি ইংরিজি গল্প পড়ে বাংলা করে শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে দুটো ভয়ের গল্প কোনদিন ভুলিনি: কোন্যান ডয়েলের ব্লু জন গ্যাপ আর ব্রেজিলিয়ান ক্যাট।

বুলুপিসির পরের বোন ছিল তুতুপিসি। তিনি থাকতেন আমাদের বাড়ি থেকে তিন মিনিটের হাঁটা পথ আপার সার্কুলার রোডে। আমাদের বাড়িতে কারুর কোনো বড় অসুখ করলে মা লেগে যেতেন সেবার কাজে। তখন আমি চলে যেতাম তুতুপিসির বাড়ি। জানালার শার্সিতে লাল-নীল-হলদে-সবুজ কাচ লাগানো মোজাইকের মেঝেওয়ালা এই আদ্যিকালের বাড়িটা আমার খুব মজার লাগত। সামনে বারান্দা ছিল একেবারে বড় রাস্তার উপর। তার একধারে রেলের লাইন, সে লাইন দিয়ে যাতায়াত করে ছোট রেলগাড়ি। যতদূর মনে পড়ে সে গাড়িতে মানুষ যাতায়াত করত না। সেটা ছিল মালগাড়ি; শহরের আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হত ধাপার মাঠে

ফেলার জন্য। লোকে ঠাট্টা করে বলত 'ধাপা মেল'।

তুতুপিসির বাড়িতে যে ক'দিন থাকতাম সে ক'দিন আমার পড়াশুনার ভার তিনিই নিতেন। আর পিসেমশাই কাজ থেকে ফিরে বিকেলে তার গাড়িতে নিয়ে যেতেন বেড়াতে। বাড়ির অসুখ সেরে গেলে আবার ফিরে যেতাম গড়পারে।

বাড়িতে থাকতে বিকেলে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম স্যার জগদীশ বোসের বাড়িতে। এ বাড়িও আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, সেই আপার সার্কুলার রোডেই। জগদীশ বোস তখন বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন; গাছের প্রাণ আছে সেটা তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর তার জন্য 'স্যার' উপাধি পেয়েছেন। অবিশ্যি আমরা তাঁর বাড়ি যেতাম তাঁকে দেখতে নয়, তাঁর বাগানের একপাশে যে চিড়িয়াখানা ছিল সেইটে দেখতে।

তবে বেশির ভাগ দিন বিকেলটা কাটত আমাদের বাড়ির ছাতে।

আমার নিজের ভাইবোন না থাকলেও, বাড়িতে যে সঙ্গী ছিল না তা নয়। রাঁধুনী বামনীর ছেলে হরেন ছিল আমার বয়সী, আর শ্যামা ঝিয়ের ছেলে ছেদি আমার চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড়। শ্যামার বাড়ি ছিল মতিহারি। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলত, তবে কোনো কারণে অবাক হলে গালে হাত চলে যেত, আর সেই সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত—'আ-গে—মইনী! দেখ্‌তো পহিলে!' ছেদি বাংলা শিখেছিল। তার অনেক গুণের মধ্যে একটা ছিল ঘুড়ির প্যাঁচে কেরামতি। মাঞ্জা দেবার কাজটা আমাদের ছাতেই তিনটি লোহার থামের গায়ে সুতো পেঁচিয়ে হয়ে যেত। লাটাই ধরার ভার ছিল আমার উপর। বিশ্বকর্মার পুজোর দিনে যখন উত্তর কলকাতার আকাশ ঘুড়িতে ছেয়ে যেত তখনই দেখা যেত ছেদির কেরামতি। চারিদিকে ছাত থেকে প্যাঁচওয়ালাদের চিৎকারে পাড়া মেতে উঠত—'দুয়োক্কো! বাড়েনাক্কো!' 'দুয়োক্কো! প্যাঁচ লড়েনাক্কো!' আর ঘুড়ি কাটলেই 'ভোকাট্টা!'

ছেদির হাতের কাজ বেশ ভালো ছিল। দশ বারো বছর বয়সেই নিজে রঙীন পাতলা কাগজ জুড়ে ফানুষ তৈরি করত যেটা আমরা কালীপুজোর দিন ছাত থেকে ওড়াতাম। এ ছাড়া আরো দুটো জিনিস ছেদি তৈরি করত যেটা আমি আর কাউকে করতে দেখিনি।

এক হল চাবি পট্‌কা। একটা হাতখানেক লম্বা বাঁকারি নিয়ে তার মাথার দিকের খানিকটা চিরে তার মধ্যে একটা চাবির হাতলের দিকটা
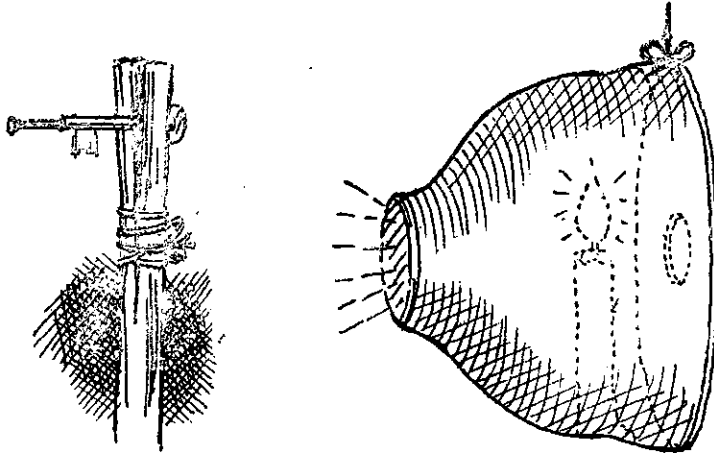
ঢুকিয়ে দিয়ে বেঁধে দিত এমন ভাবে যাতে চাবিটা সমকোণে বেরিয়ে থাকে বাঁখারি থেকে। চাবি সাধারণত দু'রকমের হয়—মাথা বন্ধ আর মাথা ফুটো। এই ব্যাপারে দরকার দ্বিতীয় ধরনের চাবি কারণ ওই ফুটোর মধ্যে পুরতে হবে বারুদ। ছোেদি দেশলাইয়ের মাথা থেকে বারুদ নিয়ে ঢুকিয়ে দিত ফুটোর মধ্যে।

এবারে সেই ফুটোয় ঢোকাতে হবে একটা বেশ আঁট-ফিটিং পেরেক, যাতে পেরেকের তলা আর বারুদের মাঝখানে ইঞ্চি খানেকের একটা ফাঁক থাকে।

এবার বাঁখারিটা হাতে শক্ত করে ধরে পেরেকের মাথাটা সজোরে দেয়ালে মারলেই বায়ুর চাপে চাবির ভিতরে বারুদ বোমার মতো শব্দ করে ফেটে উঠত।

এছাড়া ছোেদি দইয়ের ভাঁড় দিয়ে এক রকম লণ্ঠন তৈরি করত যেটা ভারী মজার লাগত আমার। ভাঁড়ের তলার গোল অংশটা কেটে বাদ দিয়ে তার জায়গায় লাগিয়ে দিত একটা রঙীন কাচ। তারপর ভাঁড়ের ভিতর পাশটায় একটা মোমবাতি দাঁড় করিয়ে, সেটাকে জ্বালিয়ে ভাঁড়ের মুখটা বন্ধ করে দিত একটা ফুটোওয়ালা পিচবোর্ড দিয়ে। ফুটোর দরকার, কারণ

বাতাস না পেলে মোমবাতি জ্বলবে না।

সবশেষে ভাঁড়ের কানায় বাঁধা দড়ি হাতে নিয়ে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করলেই দেখা যেত রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে রঙীন আলো বেরিয়ে পড়ে দিব্যি একটা বাহারের লণ্ঠনের চেহারা নিয়েছে।

ঠাকুরদার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দু'ভাই ছাড়া সকলেই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। সারদারঞ্জন ও মুক্তিরঞ্জন ছিলেন বড় এবং সেজো ভাই। ওঁদের বলতাম বড়দাদু আর মুক্তিদাদু। ওঁদের বাড়িতে গেলেই দেখতে পেতাম বৌয়েদের সিঁথেয় সিঁদুর, শাড়ি পরার ঢং আলাদা, পুরুষদের হাতে মাদুলি। পুজোর ঘর থেকে শোনা যেত শাঁখ আর ঘণ্টার শব্দ, খুড়িমা-ঠাকুমারা প্রসাদ এনে খাওয়াতেন আমাদের। কিন্তু এই তফাৎ সত্ত্বেও ওঁদের পর-পর মনে হয়নি কখনো। সত্যি বলতে কি, এক ধর্মের ব্যাপারে ছাড়া, ঠাকুরদাদাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ছিল অনেক। হিন্দু সারদা মুক্তিদা যেমন খেলাধুলা করতেন, মাছ ধরতেন, তেমনি করতেন ব্রাহ্ম কুলদা। ক্রিকেট শুরু করেন সারদা, তারপর সেটা রায় পরিবারে হিন্দু ব্রাহ্ম সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খেলাটা সত্যি করে শিকড় গেড়েছিল আমার সোনাঠাকুমার বাড়িতে। সোনাঠাকুমা হলেন আমার ঠাকুরদাদার বোন। এনার বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম বোস পরিবারে। স্বামী হেমেন বোসের ছিল পারফিউমারি বা গন্ধদ্রব্যের কারবার।

কেশে মাখো কুন্তলীন
রুমালেতে দেলখোশ,
পানে খাও তাম্বুলীন
ধন্য হোক এইচ বোস।

—এই চার লাইনের কবিতা দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরোত তখন কাগজে কাগজে।

গন্ধদ্রব্য ছাড়াও এইচ বোস আরেকটা ব্যবসা চালিয়েছিলেন কিছুদিন। সেটা ছিল এক ফরাসী কোম্পানীর সঙ্গে একজোটে গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা। সে রেকর্ড আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি। রেকর্ড ঘুরতো উলটো দিকে, আর পিন সমেত সাউন্ড বক্স নড়ত মাঝখান থেকে বাইরের দিকে।

সোনাঠাকুমা ছিলেন চোদ্দজন ছেলেমেয়ের মা। গায়ের রং ধপধপে, আশী বছর বেঁচেছিলেন, শেষ দিন অবধি একটা চুল পাকেনি, একটা দাঁত

পড়েনি।

চার মেয়ের বড় মেয়ে মালতী তখনকার দিনের নামকরা গাইয়ে। বড় ছেলে হিতেনকাকা পাকা আঁকিয়ে, ওস্তাদী গানের সমঝদার, ফারশি জানেন, দামী দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করেন। টকটকে রং, সুপুরুষ চেহারা। আরেক ভাই নীতিন (পুতুলকাকা) পরে নামকরা সিনেমা পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান হয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সে মনে আছে তিনি নিজেই ছোট মুভী ক্যামেরা দিয়ে আসামে খেদায় হাতি ধরার ছবি তুলে এনে দেখিয়েছিলেন, আর পরে সে ছবি বিলিতি কোম্পানীকে বিক্রী করেছিলেন।

পরের ভাই মুকুলের পায়ের ব্যারাম, তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটেন। পড়াশুনা খুব বেশীদূর করেননি, কিন্তু যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অসাধারণ মাথা। উদ্ভিদবিজ্ঞানী জগদীশ বোসের সূক্ষ্ম সব গবেষণার যন্ত্র কলকাতায় একমাত্র উনিই সারাতে পারেন। পরে ইনিই সিনেমা লাইনে গিয়ে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট হিসেবে বিশেষ নাম করেছিলেন।

তার পরের চার ভাই কার্তিক গণেশ বাপী বাবু সকলেই ক্রিকেট খেলে। আমি যখন ছোট, তখন কার্তিক সবে নাম্ন করেছে, আর সবাই বলছে বাঙালীদের মধ্যে এমন ব্যাটসম্যান হয়নি। অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটে ওদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা গেলেই দেখা যায়, হয় কার্তিককাকা, না হয় গণেশকাকা, একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাট হাতে স্ট্রোক প্র্যাকটিস করছে। বাড়ির মাঠে শানবাঁধানো পিচ ছিল, আর ব্যাটিং অভ্যাস করার জন্য আলাদা ব্যাট ছিল, যার দু'পাশ চেঁছে ফেলে শুধু মাঝখানের অংশটা রাখা হয়েছে।

সব মিলিয়ে অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটে বোসেদের বাড়ির মতো হৈ-হুল্লোড়ের বাড়ি আমি দুটি দেখিনি।

একটা ব্যাপারে সেই ছেলেবয়সে মনটা একটু খুঁতখুঁত করত বৈকি। ব্রাহ্মদের মাঘোৎসবে হিন্দু পুজোর মতো হৈ-হল্লা নেই। কেবল ব্রহ্মো-পাসনা আর ভগবানের বিষয় গান শোনা। একটি ব্রহ্মোপাসনা মানে দেড় থেকে দু'ঘণ্টা। আমাদের বাড়িতে শ্রাদ্ধতিথিতে উপাসনার রেওয়াজ ছিল। বসবার ঘরের চেয়ার-টেবিল সরিয়ে শ্বেতপাথরের মেঝের উপর সুজনি বিছিয়ে দেওয়া হত, আমরা তার উপরে বসতাম। তারপর হত উপাসনা আর গান। আমার মা খুব ভালো গাইতেন, তবে উপাসনার দিন যারা তেমন ভালো গান না—যেমন আমার ধনদাদু বা কাকামণি—তাঁরাও গানে যোগ দিতেন। বছরের পর বছর একই সুজনির উপর মাথা হেঁট করে

বসে উপাসনা শুনে আমার সুজনির নকসা একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

আর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল সংস্কৃত স্তোত্র আর তার বাংলাগুলো। এই বাংলা বলার একটা নিয়ম ছিল যেটা সব আচার্যই মানতেন। এই নিয়মে সব কথা টেনে টেনে বলতে হয়। যেমন, 'অসতো মা সদ্গময়' মন্ত্রের প্রথম তিন লাইনের বাংলা এই ভাবে বলা হত—

'অসত্য—হইতে—আমা—দিগ—কে—সত্যে—তে—লইয়া—যাও—, অন্ধ-কা—র—হইতে—আমা—দিগ—কে—আলোকে—লইয়া—যাও—, মৃত্যু—হইতে—আমা—দিগ—কে—অমৃতে—তে—লইয়া—যাও—'

এই 'সত্যে—তে—' আর 'অমৃতে—তে—'-র ব্যাপারে ভীষণ খট্‌কা লাগত। ওরকম করে না বলে 'সত্যে লইয়া যাও' আর 'অমৃতে লইয়া যাও' বললেই ত হয়। কিম্বা শেষে যদি আরেকটা 'তে' জুড়তেই হয় তাহলে 'সত্যতে' আর 'অমৃততে' বললে কি ভুল হয়? কিন্তু আচার্যদের মনে নিশ্চয়ই এ খট্‌কা লাগেনি, না হলে তাঁরা সকলেই বছরের পর বছর এই একই ভাবে বলে চলবেন কেন?

ব্রাহ্ম মন্দির একটা ভবানীপুরেও আছে আর সেখানেও মাঘোৎসব হয়। কিন্তু আমরা যখন গড়পার ছেড়ে ভবানীপুরে চলে আসি তখনও এগারই মাঘের বড় উৎসবের দিন আমরা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ব্রাহ্ম মন্দিরেই যেতাম। ওই পাড়াটাকেই বলত সমাজ পাড়া। শীতকালের ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে স্নান করে যেতে হত। প্রথমে হত ঘণ্টা খানেক ব্রহ্মকীর্তন, তারপর ঘণ্টা আড়াই গান ও উপাসনা। বসার ব্যবস্থা কাঠের বেঞ্চিতে, তার পিঠ এতই সোজা যে তাতে আরামের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মাঘোৎসবের শুধু তিনটে দিন আমাদের একটু আমোদ হত। সেটা হল একটা বিশেষ দিনে উপাসনার পর খিচুড়ি খাওয়া, একটা দিন পিকনিক, আর একটা দিন বালক-বালিকা সম্মেলন। এই শেষ ব্যাপারটায় গুরু-গম্ভীর উপাসনার কোনো বালাই নেই।

কিন্তু তাহলেও ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে ঠাকুর সাজিয়ে হিন্দু পুজোর যে একটা হৈ-হল্লা জাঁকজমকের দিক আছে, সেটা ব্রাহ্ম উৎসবে মোটেই ছিল না। কালীপুজোয় বাজি পোড়ানো ফানুস ওড়ানোয় আমরাও যোগ দিতাম বটে, আর আমাদের ছেলেবেলার তুবড়ি-হাউই-ফুল-ঝুরি-রংমশাল-চটপটি-চীনেপটকা মিলিয়ে যে আনন্দ সেটা আজকালকার

কান-ফাটানো বুক-কাঁপানো বোম-পট্‌কার যুগে একেবারেই নেই—কিন্তু বছরের বিশেষ ক'টা দিনে সারা শহর মিলে আমোদ করার ব্যাপারটা ব্রাহ্মদের মধ্যে ছিল না।

তাই বোধহয় খ্রীষ্টানদের বড়দিনটাকে নিজেদের পরবের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবার একটা চেষ্টা ছিল সব সময়। বড়দিন এলে মনটা নেচে উঠত সেই কারণেই।

কলকাতায় তখন সাহেবদের বড় দোকান (আজকাল যাকে বলে ডিপার্ট-মেণ্ট স্টোর) ছিল হোয়াইটআওয়ে লেইড্‌ল। চৌরঙ্গীতে এখন যেখানে মেট্রো সিনেমা তখন সেখানে ছিল স্টেটসম্যান পত্রিকার অফিস। তার পাশে সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে ঘড়িওয়ালা বড় বাড়িটা ছিল হোয়াইট-আওয়ের বাড়ি। বিশাল দোতলা দোকানের পুরো দোতলাটা বড়দিনের ক'টা দিন হয়ে যেতো 'টয়ল্যাণ্ড'। একবার মা'র সঙ্গে গেলাম এই টয়ল্যাণ্ড দেখতে।

তখন দেশে সাহেবদের রাজত্ব। হোয়াইটআওয়ে সাহেবদের দোকান। বিক্রেতারা সব সাহেব; যারা খদ্দের তাদেরও বেশির ভাগই সাহেব মেম-সাহেব। গিয়ে সব দেখেটেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু টয়ল্যাণ্ডে যে যাব, দোতলার সিঁড়ি কই? জীবনে সেই প্রথম জানলাম লিফ্‌ট কাকে বলে। হোয়াইটআওয়ের দোকানের লিফ্‌টই বোধহয় কলকাতার প্রথম লিফ্‌ট।

সোনালী রঙ করা লোহার খাঁচায় দোতলায় উঠে এসে মনে হলো স্বপ্নরাজ্যে এসেছি। মেঝের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড় নদী ব্রিজ টানেল সিগন্যাল স্টেশন সমেত খেলার রেলগাড়ি এঁকেবেঁকে চক্কর মেরে চলেছে রেললাইন দিয়ে। এ ছাড়া ঘরের চারদিকে রয়েছে নানা রঙের বেলুন, রঙীন কাগজের শিকল, ঝালর, ফুল ফল আর চীনে লণ্ঠন। তার উপরে রঙবেরঙের বল আর তারায় ভরা ক্রিসমাস ট্রী, আর যেটা সবচেয়ে বেশি চোখ টানছে—গালফোলা হাসি নিয়ে দাড়িমুখো লাল জামা লাল টুপি পরা তিন মানুষ সমান বড় ফাদার ক্রিসমাস।

খেলনা যা আছে তা সবই বিলিতি। তার মধ্যে থেকে আমাদের সাধ্যে কুলোয় এমন এক বাক্স ক্র্যাকার নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সেরকম ক্র্যাকার আজকাল আর নেই। তার যেমনি আওয়াজ, তেমনি সুন্দর তার ভিতরের খুদে খুদে জিনিসগুলো।

বড় আর বাহারের দোকান বলতে তখন যা ছিল তার বেশির ভাগই

চৌরঙ্গীতে। তার মধ্যে হোয়াইটআওয়ের কাছেই একটা দোকান ছিল যেটা বাঙালীর দোকান। কার এণ্ড মহলানবিশ। গ্রামোফোন আর খেলার সরঞ্জামের দোকান। দোকানে বসতেন যিনি, তাঁকে আমরা কাকা বলতাম—বুলাকাকা। এই দোকানে একটা বাহারের চেয়ার ছিল যেটা আসলে একটা ওয়েইং মেশিন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে গেলেই বুলাকাকার দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসে ওজন হয়ে আসাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাবা মারা যাবার পরে এই বুলাকাকাই আমাকে এনে দিয়েছিলেন একটা গ্রামোফোন। সেই থেকে আমার গ্রামোফোন আর রেকর্ডের শখ। আমার নিজের দুটো খেলনা গ্রামোফোন ছিল—সেগুলোও সম্ভবত বুলাকাকারই দেওয়া। একটার নাম পিগমিফোন, একটার কিডিফোন। তাদের সঙ্গে বেশ কিছু বিলিতি গান-বাজনার রেকর্ডও ছিল লুচির সাইজের।

কলকাতার রেডিও স্টেশন চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে বুলাকাকাই আমাকে জন্মদিনে একটা রেডিও উপহার দিয়েছিলেন। সে রেডিও আজকের দিনের রেডিওর মতো নয়। তাকে বলত ক্রিস্ট্যাল সেট। কানে হেড-ফোন লাগিয়ে শুনতে হত; অর্থাৎ এক সঙ্গে একজনের বেশি শুনতে পেত না রেডিও প্রোগ্রাম।

বুলাকাকার সঙ্গেই আমরা একবার গিয়েছিলাম উটরাম রেস্টোরাণ্টে। উটরাম ঘাটে এই বাহারের রেস্টোরাণ্টটা জলের উপর ভাসত। দেখতে ঠিক জাহাজের ডেকের মতো। এখন উটরাম ঘাটে গেলে আগের সেই চেহারাটা আর দেখা যাবে না। তখন ঘাটের উল্টোদিকে ইডেন গার্ডেনের চারদিকে বাহারের গ্যাসের বাতি জ্বলত, আর বাগানের মাঝখানে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে সন্ধ্যা-বেলা বাজত গোরাদের ব্যাণ্ড। উটরাম রেস্টোরাণ্টে আমি জীবনে প্রথম আইসক্রীম খাই। অবিশ্যি এই নিয়ে পরে অনেকদিন ঠাট্টা শুনতে হয়েছিল; কারণ প্রথম চামচ মুখে দিয়ে দাঁত ভীষণ সিরসির করায় আমি বলেছিলাম আইসক্রীমটা একটু গরম করে দিতে।

ভবানীপুর

সন্দেশ পত্রিকা বন্ধ হবার কিছুদিন পরেই যে ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের ব্যবসাও কেন উঠে গেল, সেটা অত ছেলেবয়সে আমি জানতেই পারিনি। শুধু শুনলাম মা একদিন বললেন আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

গড়পার ছেড়ে, আর সেই সঙ্গে উত্তর কলকাতা ছেড়ে, আমরা দুজন চলে এলাম ভবানীপুরে আমার মামার বাড়িতে। আমার বয়স তখন ছয়ের কাছাকাছি। আমার মনে হয় না সে বয়সে বড় বাড়ি থেকে ছোট বাড়ি, বা ভালো অবস্থা থেকে সাধারণ অবস্থায় গেলে মনে বিশেষ কষ্ট হয়। 'আহা বেচারা' কথাটা ছোটদের সম্বন্ধে বড়রাই ব্যবহার করে; ছোটরা নিজেদের বেচারা বলে ভাবে না।

ভবানীপুরে বকুল বাগানের বাড়িতে এসেই যেটা আমাকে অবাক করেছিল সেটা হল চীনে মাটির টুকরো বসানো নকশা করা মেঝে। এ জিনিস এর আগে কখনো দেখিনি। অবাক হয়ে দেখতাম, আর মনে হত, বাপ্‌রে বাপ্‌, না জানি কত পেয়ালা পিরিচ প্লেট ভেঙে তৈরি হয়েছে এই মেঝে! টুকরোগুলোর বেশির ভাগই সাদা, তবে তার মধ্যে হঠাৎ এক-একটার কোণে হয়ত এক চিলতে ফুল, বা তারা, বা ঢেউখেলানো লাইন। কিছু করার না থাকলে এই চীনে মাটির টুকরোগুলো দেখে অনেকটা সময় কেটে যেত।

আরেকটা ভালো জিনিস ছিল এ বাড়িতে যেটা গড়পারে পাইনি। সেটা হল রাস্তার দিকে বারান্দা। শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দা. সকাল দুপুর বিকেলভরে দেখতাম রাস্তায় কতরকম লোকের চলাফেরা। দুপুরে যেত ঠেলা গাড়িতে রঙবেরঙের জিনিস নিয়ে ফেরিওয়ালা—'জার্মান ওয়ালা দোআনা, জাপান ওয়ালা দোআনা'। সপ্তাহে দু'দিন না তিনদিন যেত মিসেস উডের বাক্সওয়ালা। বারান্দা থেকে মা-মাসি ডাক দিতেন 'এই

বাক্সওয়ালা, এখানে এস'। মনটা নেচে উঠত, কারণ বিকেলের খাওয়াটা জমবে ভাল; বাক্সে আছে মেমসাহেবের তৈরি কেক, পেস্ট্রি, প্যাটি।

সন্ধ্যে যখন হব-হব, তখন শোনা যেত সুর করে গাওয়া 'ময় লাহুঁ মজেদা-র, চানাচো-র গরম্'; আর কিছু পরেই শুরু হয়ে যেত রাস্তার ওপারে চাটুজ্যেদের বাড়ি থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কর্কশ গলায় কালোয়াতি গানের রেওয়াজ।

গ্রীষ্মকালের দুপুরে যখন শোবার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হত, তখনও কেমন করে জানি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসার দরুন দিনের একটা বিশেষ সময় রাস্তার উল্টো ছবি পড়ত জানালার বিপরীত দিকের দেয়ালের অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বন্ধ ঘরে ম্যাজিকের মতো রাস্তার লোক চলাচল দেখা যেত, গাড়ি রিক্সা সাইকেল পথচারী সব কিছু দিব্যি বোঝা যেত ওই ছবিতে। কতদিন যে দুপুরে শুয়ে শুয়ে এই বিনে পয়সার বায়স্কোপ দেখেছি তার ঠিক নেই।

আমাদের বাড়ির সদর দরজায় একটা ছোট্ট ফুটো ছিল। দরজা বন্ধ করে সেই ফুটোর সামনে ঘষা কাচ ধরলেও বাইরের দৃশ্য খুদে আকারে উল্টো করে সেই কাচের উপর স্পষ্ট দেখা যেত। এটা নতুন কিছু নয়। এটাই হল ফোটোগ্রাফির গোড়ার কথা, আর এটা যে-কেউ নিজের বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। কিন্তু তখন অজান্তে ব্যাপারটা ঘটতে দেখে ভারী অবাক লেগেছিল।

যে-মামার বাড়িতে উঠেছিলাম তিনি হলেন আমার সোনামামা। মামারা ছিলেন চার ভাই, তিন বোন। ছোটমামা আমার জন্মের আগেই মারা

গিয়েছিলেন। বড় আর মেজোমামা ছিলেন পাটনা আর লখ্নৌ-এর ব্যারিস্টার। তৃতীয় মামা ছিলেন সোনামামা। ইনি বিলেত যাননি, আর এ'র মধ্যে সাহেবিয়ানার লেশমাত্র ছিল না। আমারই এক মেসোমশাই ছিলেন এক ইনসিওরেন্স কোম্পানির মালিক, তখনকার দিনে বাঙালীদের এক জাঁদরেল কোম্পানি, সেই কোম্পানিতে কাজ করতেন সোনামামা।

সোনামামার অঙ্কের মাথা ছিল অসম্ভব পরিষ্কার। মনে আছে পরে যখন ইস্কুলে ভর্তি হই, আমার অ্যানুয়েল পরীক্ষার অঙ্কের প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে সিঁড়িভাঙার অংকটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, 'এটার উত্তর ত আট, তাই না?' আমার কাছে জিনিসটা ভেলকির মতো মনে হয়েছিল।

এমনিতে গম্ভীর মেজাজের লোক হলেও সোনামামার একটা ছেলে-মানুষী দিক ছিল। মামার বয়স তখন ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু সমবয়সী আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে তখনও রবিবার সকালে তুমুল উৎসাহে খেলা চলেছে ক্যারাম আর লুডো। পরে এল ব্যাগাটেল; তাতেও উৎসাহের কমতি নেই। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আর মাঝে মাঝে শুনতে হত— 'উঁহু, বড়দের মধ্যে থেক না মানিক'। আমি বেরিয়ে আসতাম ঠিকই, কিন্তু এটাও মনে হত যে মামারা যে কাজটা করছেন সেটাকে ঠিক বড়দের মানানসই কাজ বলা চলে না।

আসলে আমার অনেকটা সময় একাই কাটাতে হত; বিশেষ করে দুপুর বেলাটা। কিন্তু তাতে আমার কোনোদিন একঘেঁয়ে লেগেছে বলে মনে পড়ে না। দশ খণ্ডের বুক অফ নলেজের পাতা উলটিয়ে ছবি দেখা ছিল এই অবসর সময়ের একটা কাজ। এ বইগুলো কখনো পুরোন হয়নি। পরে মা কিনে দিয়েছিলেন চার খণ্ডে রোম্যান্স অফ ফেমাস লাইভ্স। ছবিতে বোঝাই বিখ্যাত বিদেশী লোকেদের জীবনী।

বই ছাড়াও সময় কাটানোর জন্য ছিল একটা আশ্চর্য যন্ত্র। সেটার নাম স্টিরিওস্কোপ। তখন অনেকের বাড়িতেই এ জিনিসটা দেখা যেত, আজকাল আর যায় না। ভিকটোরীয় যুগের আবিষ্কার এই যন্ত্র। তলায় একটা হাতল, সেটা ধরে ফ্রেমে আঁটা জোড়া আতস কাচ দুই চোখের সামনে ধরতে হয়। কাচের সামনে হোল্ডারে দাঁড় করানো থাকে ছবি। একটি ছবি নয়; লম্বা কার্ডে পাশাপাশি দুটো ফোটোগ্রাফ। দেখলে মনে হবে একই ছবি, কিন্তু আসলে তা নয়। দৃশ্য একই, কিন্তু সেটা তোলা হয়েছে এমন
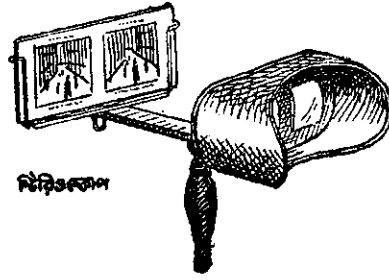
স্টিরিওস্কোপ

ক্যামেরা দিয়ে যার সামনে একটার বদলে দুটো লেন্স—যেন মানুষের দুটো চোখ। বাঁ দিকের লেন্স তুলছে বাঁ চোখ যা দেখে তাই, আর ডান দিকটা তুলছে ডান চোখের দৃষ্টি দিয়ে। জোড়া কাচের ভিতর দিয়ে যখন দেখা যায়, তখন দুটো ছবি মিলে একটা হয়ে যায়, আর মনে হয় যেন জীবন্ত দৃশ্য দেখছি। স্টিরিওস্কোপের সঙ্গে ছবিও কিনতে পাওয়া যেতো নানা দেশের নানা রকমের।

আরেকটা খেলার যন্ত্র ছিল আমার, সেটাও আর আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না। সেটা হল ম্যাজিক ল্যানটার্ন। বাক্সের মতো দেখতে, সামনে চোঙার মধ্যে লেন্স, মাথার উপর চিমনি আর ডান পাশে একটা হাতল। তাছাড়া আছে দুটো রীল, একটায় ফিল্ম ভরতে হয়, সেই ফিল্ম হাতল ঘোরালে অন্য রীলে গিয়ে জমা হয়। ফিল্মটা চলে লেন্সের ঠিক পিছন দিয়ে। বাক্সের ভিতর জ্বলে কেরোসিনের বাতি, তার ধোঁয়া বেরিয়ে যায় চিমনি দিয়ে, আর তার আলো ঘুরন্ত ফিল্মের চলন্ত ছবি ফেলে দেয়ালের উপর। কে জানে, আমার ফিল্মের নেশা হয়ত এই ম্যাজিক ল্যানটার্নেই শুরু।

মামার খেলার সাথীদের মধ্যে ছিলেন আরেক মামা, যিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন এক তলার পূর্বদিকের ঘরে। আসলে ইনি আত্মীয় নন। ঢাকায় মামাবাড়ির পাশেই ছিল এঁদের বাড়ি। সেই সূত্রে বন্ধু, আর তাই আমি বলি মামা। কালুমামা। কলকাতায় এসেছিলেন চাকরির খোঁজে। চাকরি পাবার কিছু দিনের মধ্যেই কিনে আনলেন ত্রিশ টাকা দামের একটা ঝক্‌ঝকে নতুন র‍্যালে সাইকেল। ছ'মাস ব্যবহারের পরেও এই সাইকেল ছিল ঠিক নতুনের মতোই ঝক্‌ঝকে, কারণ রোজ সকালে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরে কালুমামা সাইকেলের পরিচর্যা করতেন।

সোনামামা আমুদে লোক ছিলেন বলেই বকুলবাগানে এসে মাঝে মাঝে

বায়স্কোপ, সার্কাস, ম্যাজিক, কার্নিভ্যাল ইত্যাদি দেখার সুযোগ আসত। একবার এম্পায়ার থিয়েটারে (যেটা এখন রক্সি) এক সাহেবের ম্যাজিক দেখতে গেলাম। নাম শেফালো। খেলার পর খেলা দেখিয়ে চলেছেন, আর তার সঙ্গে কথার ফোয়ারা ছুটছে। পরে জেনেছিলাম জাদুকরের এই বুকনিকে বলা হয় 'প্যাটার'। এই প্যাটারের গুণে দর্শকের দৃষ্টি চলে যায় জাদুকরের মুখের দিকে, আর তার ফলে হাতের অনেক কারসাজি দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু শেফালোর দলে ছিলেন এক জাদুকরী, নাম মাদাম প্যালার্মো। তিনি ম্যাজিক দেখালেন একেবারে বোবা সেজে। এ জিনিস আর কখনো দেখিনি।

এর কিছুদিন পরে এক বিয়ে বাড়িতে একজন বাঙালীর ম্যাজিক দেখেছিলাম যার কাছে শেফালো সাহেবের স্টেজের কারসাজি কিছুই না। স্টেজ ম্যাজিকে নানান যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়, আলোর খেলা আর প্যাটারের জোরে লোকের চোখ মন ধাঁধিয়ে যায়। ফলে জাদুকরের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখালেন প্যাণ্ডেলের তলায় ফরাসের উপর বসে, তাঁর চারিদিক ঘিরে চার পাঁচ হাতের মধ্যে বসেছেন নিমন্ত্রিতরা। এই অবস্থাতে একটার পর একটা এমন খেলা দেখিয়ে গেলেন ভদ্রলোক যা ভাবলে আজও তাজ্জব বনে যেতে হয়। এই জাদুকরকে অনেক পরে আমার একটা ছোট গল্পে ব্যবহার করেছিলাম। ফরাসের উপর দেশলাইয়ের কাঠি ছড়িয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক, নিজের সামনে রেখেছেন একটা খালি দেশলাই-য়ের বাক্স। তারপর 'তোরা আয় একে একে' বলে ডাক দিতেই কাঠিগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে বাক্সয় ঢুকছে। আমাদেরই চেনা এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন একটা রুপোর টাকা, আর আরেকজনের কাছ থেকে একটা আংটি। প্রথমটাকে রাখলেন হাত চারেক দূরে, আর দ্বিতীয়টাকে নিজের সামনে। তারপর আংটিটাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যা, টাকাটাকে নিয়ে আয়।' বাধ্য আংটি গড়িয়ে গেল টাকার কাছে, তারপর দুটো একসঙ্গে গড়িয়ে এল ভদ্রলোকের কাছে। আরেকটা ম্যাজিকে এক ভদ্রলোকের হাতে এক প্যাকেট তাস ধরিয়ে দিয়ে আরেকজনের হাত থেকে লাঠি নিয়ে ডগাটা বাড়িয়ে দিলেন তাসের দিকে। তারপর বললেন, 'আয়রে ইস্কাপনের টেক্কা!' প্যাকেট থেকে সড়াৎ করে ইস্কাপনের টেক্কাটা বেরিয়ে এসে লাঠির ডগায় আঁটকে ধরধর করে কাঁপতে লাগল।

ম্যাজিক দেখার কয়েকদিন পরে হঠাৎ জাদুকরের সঙ্গে দেখা বকুল-

বাগান আর শ্যামানন্দ রোডের মোড়ে। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, পরনে ধুতি আর শার্ট, দেখলে কে বলবে ভদ্রলোকের এত ক্ষমতা। আমার ম্যাজিকের ভীষণ শখ, মনে মনে আমি তাঁর শিষ্য হয়ে গেছি। ভদ্রলোককে বললাম আমি তাঁর কাছে ম্যাজিক শিখতে চাই। 'নিশ্চয়ই শিখবে' বলে ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাকে একটা খুব মামুলি ম্যাজিক শিখিয়ে দিলেন। তারপর আর ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ সামনে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে ওঁর ঠিকানাটাও নেওয়া হয়নি। পরে ম্যাজিকের বই কিনে হাত সাফাইয়ের অনেক ম্যাজিক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই অভ্যেস করে শিখেছিলাম। কলেজ অবধি ম্যাজিকের নেশাটা ছিল।

সার্কাস তো এখনও প্রতি বছরই আসে, যদিও তখনকার দিনে হার্মস্টোন সার্কাসে সাহেবরা খেলা দেখাত, আর আজকাল বেশির ভাগই মাদ্রাজি সার্কাস। যেটা আজকাল দেখা যায় না সেটা হল কার্নিভ্যাল। আমাদের ছেলেবেলায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর দুধারে ছিল বড় বড় মাঠ। কলকাতার প্রথম 'হাই-রাইজ' দশ তলা টাওয়ার হাউস তখনও তৈরি হয়নি, ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর ভিক্টোরিয়া হাউস তৈরি হয়নি। এই সব মাঠের একটাতে সার্কাসের কাছেই বসত কার্নিভ্যাল।

কার্নিভ্যালের মজাটা যে কী সেটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝানো মুশকিল। মেলায় নাগরদোলা সকলেই দেখেছে, কিন্তু কার্নি-ভ্যালের নাগরদোলা বা জায়াণ্ট হুইল হত পাঁচ তলা বাড়ির সমান উঁচু। বহু দূর থেকে দেখা যেত ঘুরন্ত হুইলের আলো। এই নাগরদোলা ছাড়া থাকত মেরি-গো-রাউন্ড, এরোপ্লেনের ঘূর্ণি, খেলার মোটর গাড়িতে ঠোকা-ঠুকি, ঢেউখেলানো অ্যালপাইন রেলওয়ে, আর আরো কত কী। এসবেরই চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত নানা রকম জুয়ার স্টল। এত লোভনীয় সব জিনিস সাজানো থাকত এই সব স্টলে যে খেলার লোভ সামলানো কঠিন হত। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে জুয়া খেলাটা সরকার বেআইনী করে দেওয়ার ফলে কলকাতা শহর থেকে কার্নিভ্যাল উঠে গেল। আসল রোজগারটা হত বোধহয় এই জুয়া থেকেই।

ভবানীপুরে যখন প্রথম আসি তখনও ফিল্মে কথা আসেনি। তখনকার বিলিতি হাউসগুলোতে ছবির সঙ্গে কথার বদলে শোনা যেত সাহেবের

বাজানো পিয়ানো বা সিনেমা অর্গ্যান। এই সিনেমা অর্গ্যান জিনিসটা কলকাতায় মাত্র একটা থিয়েটারেই ছিল। সেটা হল ম্যাডান, বা প্যালেস অফ ভ্যারাইটিজ। আজকাল এর নাম হয়েছে এলিট সিনেমা। অর্গ্যানের নাম ছিল Wurlitzer, আর তার আওয়াজ ছিল ভারী জমকালো। যে সাহেব এই যন্ত্রটি বাজাতেন তাঁর নাম ছিল বায়রন হপার। রোজ কাগজে দেওয়া থাকত হপার সাহেব সেদিনের ছবির সঙ্গে কী কী সংগীত বাজাবেন তার তালিকা।

এই সময় দেখা ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে আছে Ben Hur, Count of Monte Cristo, Thief of Bagdad আর Uncle Tom's Cabin। গ্লোবে তখন ছবির সঙ্গে স্টেজে নাচ-গানের বন্দোবস্ত ছিল। আজকাল যেমন সিনেমা থিয়েটারে গিয়ে দেখা যায় কাপড়ের পর্দা ঝুলছে, তখন তা ছাড়া আরেকটা বাড়তি পর্দা থাকত। বিজ্ঞাপনে ভরা এই পর্দাকে বলত সেফ্‌টি কার্টেন। সবচেয়ে প্রথমে উঠত এই পর্দা, তার কিছুক্ষণ পরে কাপড়ের পর্দা। গ্লোবে কাপড়ের পর্দা উঠলে পরে বেরিয়ে পড়ত স্টেজ। তাতে রঙতামাশা শেষ হলে পর নেমে আসত সিনেমার সাদা স্ক্রীন। তারপর ছবি শুরু। পর্দার সামনে এক পাশে থাকত পিয়ানো। ছবির ঘটনার মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে সাহেব বাজনা চালিয়ে যেতেন যতক্ষণ ফিল্ম চলে।

Uncle Tom's Cabin ছবি দেখতে গিয়ে এক মজা হল। বাড়ির সবাই মিলে গিয়েছি গ্লোব সিনেমায়। নিগ্রো দাস আংকল টম তার নৃশংস মনিব সাইমন লেগ্রীর চাবুক খেয়ে দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মরে গেছে। আমাদের সকলের রাগ পড়ে আছে লেগ্রীর উপর। ছবির শেষ দিকে টম ভূত হয়ে ফিরে আসে মনিবের কাছে। মনিব সেই ভূতের দিকেই চাবুক চালায়, টম হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে তার দিকে। কালুমামা আমার পাশে বসে হাঁ করে ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ আর থাকতে না পেরে হল-ভর্তি লোকের মধ্যে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার শুরু করে দিলেন—'হালায় এহনো চাবুক মারে? এহনো চাবুক মারে? শয়তান!—এইবার বুঝবি তর পাপের ফল!'

১৯২৮ সালে হলিউডে প্রথম সবাক ছবি তৈরি হল। কলকাতায় প্রথম টকি এল তার এক বছর পরেই। তার পরেও বছর খানেক ধরে এমন বেশ কিছু ছবি এসেছে যেগুলোর কিছু অংশে শব্দ আছে, কিছুতে নেই।

যার পুরোটাতে শব্দ আছে কাগজে সেটার বিজ্ঞাপন হত '100% Talkie' বলে। আমার দেখা প্রথম টকি সম্ভবত 'টার্জান দি এপ্ ম্যান'। গ্লোবে এসেছে ছবি, প্রথম দিন দেখতে গিয়ে টিকিট পাওয়া গেল না। আমায় নিয়ে গেছেন আমার এক মামা। আমার মুখ দেখে তাঁর বোধহয় দয়া হল, বুঝলেন আজ একটা কিছু না দেখে বাড়ি ফেরা উচিত হবে না।

কাছেই ছিল অলবিয়ন থিয়েটার, যেটার নাম এখন রিগ্যাল। সেখানে টিকিট ছিল, কিন্তু সেটা বাংলা ছবি, আর মোটেই সবাক নয়। ছবির নাম 'কাল পরিণয়'। সেটা যে ছোটদের উপযোগী নয়, সেটা আমিও খানিকটা দেখেই বুঝেছিলাম। মামা আমার দিকে ফিরে চাপা গলায় বার কয়েক জিগ্যেস করলেন 'বাড়ি যাবে?' আমি সে-প্রশ্নে কানই দিলাম না। একবার যখন ঢুকেছি তখন কি আর পুরোটা না দেখে বেরোন যায়? অবিশ্যি এই 'কাল পরিণয়' দেখে আমার মনে একটা নাক-সিঁটকোন ভাব জেগেছিল যেটা বহুকাল আমাকে বাংলা ছবির দিকে ঘেঁষতে দেয়নি।

যে মামার সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম তিনি ছিলেন লেবুমামা। মা'র মাস্‌তুতো ভাই। কালুমামার মতো ইনিও ঢাকা থেকে এসেছিলেন কলকাতায় চাকরির খোঁজে। এঁরও স্থান হয়েছিল আমার মামার বাড়িতেই। এখানে মা'র আরেক মাস্‌তুতো ভাইয়ের কথা বলা দরকার, কারণ ননী-মামার মতো ঠিক আরেকটি লোক আমি বেশি দেখিনি। ছ'ফুট লম্বা, তীরের মতো সোজা, পরনে মালকোচা মারা খাটো ধুতি আর থ্রী-কোয়ার্টার হাতা খাটো খদ্দরের পাঞ্জাবী। ইনি হাঁটতেন হন্‌হনিয়ে একেবারে মিলিটারি মেজাজে আর বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন ভয়ংকর চেঁচিয়ে। যারা গাঁয়েদেশে মানুষ হয় তাদের স্বভাবতই মাঠেঘাটে গলা ছেড়ে কথা বলতে হয়। সেই অভ্যাসটাই হয়ত বেশি বয়সে শহরে এসেও থেকে যায়। তবে, চেঁচিয়ে কথা বললেও ননীমামার কথার মধ্যে একটা মেয়েলি টান ছিল। আর তিনি কাজের মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু যে কাজগুলো সত্যিই ভালো করতেন সেগুলো সবই মেয়েলি কাজ। বিয়ে করেননি। যদি করতেন তবে গিন্নী-পনাতে মামাকে হার মানাতে পারে এমন মেয়ে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। মামা সেলাই এবং রান্না দুটোতেই ছিলেন ওস্তাদ। পরের দিকে চামড়ার কাজ শিখে তার উপর একটা বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। 'বাঙালীর মিষ্টি' বলে একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা বেরোল না কেন জানি না।

এই ননীমামার কাছ থেকেই চামড়ার কাজ শিখে মা নিজেও ক্রমে একজন এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন মা সারা দুপুর বসে ওই কাজই করতেন। চামড়ায় যে রং লাগে তার সঙ্গে স্পিরিট মেশাতে হয়; সেই স্পিরিটের গন্ধে সারাক্ষণ ঘর ভরে থাকত। পরিপাটি হাতে তৈরি ব্যাগ, বটুয়া, চশমার কেস ইত্যাদি মা কিছু বিক্রীও করেছিলেন। এরও পরে মা মাটির মূর্তি গড়ার কাজ শিখেছিলেন তখনকার নামকরা মৃৎশিল্পী নিতাই পালের কাছে। মা'র তৈরি বুদ্ধ আর প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি এখনও আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আছে।

এসব বিশেষ ধরনের কাজ ছাড়া একজন সুগৃহিণী যেসব কাজ ভালো করেন সেগুলো ত মা করতেনই। সেই সঙ্গে মা'র হাতের লেখাও ছিল অত্যন্ত পরিপাটি। যেমন বাংলা তেমন ইংরিজি।

সোনামামার তখন আর্সকিন সিডান গাড়ি হয়েছে, যার নাম এই ফিয়াট-অ্যাম্বাসাডরের যুগে আর প্রায় কেউই জানে না। এই গাড়িতে করে বিকেলে মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতাম। তখন গড়ের মাঠে সাহেবরা গল্‌ফ খেলত, তাই নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়াবার উপায় ছিল না। কোন্‌ সময় কোন্‌ দিক থেকে যে বল ধেয়ে আসবে বুলেটের মতো তা বলা যেত না। একবার একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, দেখতে পাইনি যে একটা বল সটান আসছে আমারই দিকে। ড্রাইভার সুধীরবাবু হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মেরে আমাকে সরিয়ে নিলেন, আর বল আমাদের দুজনের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রেলিং-এর দিকে।

সুধীরবাবু থাকতেন আমাদের বাড়ির ছাতের ঘরে। তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে। হঠাৎ একদিন এক ঢাউস তকলি আর একতাল তুলো কিনে এনে তাঁর ঘরে বসে সুতো কাটা শুরু করে দিলেন। এটাও অবিশ্যি আন্দোলনেরই একটা অংশ। তার অল্পদিনের মধ্যেই ছোঁয়াচে ব্যারামের মতো ঘরে ঘরে সুতো কাটা আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতেও সকলের জন্যই একটা করে তকলি চলে এল, এমন কি আমারও। মাস খানেকের মধ্যেই দেখলাম আমিও দিব্যি সুতো কাটতে পারছি। তবে সুধীরবাবুই চ্যাম্পিয়ন হলেন। নিজের কাটা সুতো দিয়ে ফতুয়া বানাতে আর কেউ পারেনি।

কলকাতায় তখন এক বিরাট স্বদেশী মেলা হয়েছিল, আমরা সবাই
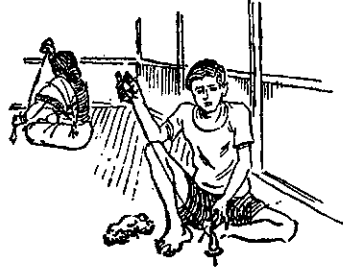
দেখতে গিয়েছিলাম। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে তখন একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠ ছিল, তাকে বলত জিমখানা ক্লাবের মাঠ। এখন সেখানে বাড়ি উঠে গেছে। সেই মাঠে বসেছিল স্বদেশী মেলা। মেলার সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস ছিল দেশনেতাদের মোমের মূর্তি। এই মূর্তির বিশেষত্ব ছিল এই যে এগুলোর হাত পা মাথা যন্ত্রের সাহায্যে নড়াচড়া করত। পার্টিশন দেওয়া পর পর ঘরে আলাদা আলাদা দৃশ্য। একটা ঘরে মহাত্মা গান্ধী জেলের কামরায় মাটিতে বসে লিখছেন, দরজার বাইরে সশস্ত্র প্রহরী। মহাত্মাজীর হাতে কলম, কোলের উপর প্যাড। প্যাডের হাত লেখার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক চলছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও এদিক ওদিক ঘুরছে। আরেকটা ঘরে ভারতমাতার বিরাট মূর্তি, তিনি দুহাতে বহন করছেন দেশবন্ধুর মৃতদেহ। ভারতমাতা দেশবন্ধুর দিকে চেয়ে দেখছেন, পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে বিষণ্ণভাবে মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। কে তৈরি করেছিল এই মোমের মূর্তি তা মনে নেই—সম্ভবত বম্বের কোনো শিল্পী—তবে দেখে সত্যিই জীবন্ত বলে মনে হত। কলকাতা শহরে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই মূর্তি নিয়ে।

আমার দিদিমা আমাদের সঙ্গে বকুলবাগানেই থাকতেন। ফরসা, ছিপ-ছিপে, সুন্দরী ছিলেন দিদিমা। চমৎকার গানের গলা ছিল। তাঁর মুখে শোনা ময়মনসিংহের গান 'চরকার নাচন দেইখ্যা যালো তরা' এখানে কানে লেগে আছে। সালটা বোধহয় ১৯২৬; এমন সময় একবার আমার সব মামা মাসি তাঁদের স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে মিলে একসঙ্গে এলেন কলকাতায়। এ ঘটনা বড় একটা ঘটে না। মেজোমামা থাকেন লখ্নৌ-এ, বড়মামা পাটনায়, বড়মাসি পূর্ববঙ্গে কাকিনায়; মেসো কাকিনা এস্টেটের ম্যানেজার।

সবাই কলকাতা আসাতে ঠিক হল দিদিমার সঙ্গে গ্রুপ ফোটো তোলা হবে। তখনকার দিনে অনেকের বাড়িতেই ক্যামেরা থাকত না; বা থাকলেও, সেটা হত চার-পাঁচ টাকা দামের বক্স ক্যামেরা; তাই দিয়ে তেমন ভালো ছবি উঠত না, অন্তত বাঁধিয়ে রাখার মতো গ্রুপ ছবি ত নয়ই। তাই কোনো বিশেষ উপলক্ষে সাহেব দোকানে গিয়ে গ্রুপ ছবি তোলানোর রেওয়াজ ছিল। বাঙালী দোকানও যে ছিল না তা নয়, তবে তার বেশির ভাগই উত্তর কলকাতায়। সাহেব দোকানের মধ্যে এককালে দুটি ছিল কলকাতার সবচেয়ে নাম করা—বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ড আর জনস্টন অ্যান্ড হফম্যান। তখন এই দুটো দোকানের বয়স প্রায় সত্তর বছর, আর অবস্থাও আগের মতো নেই। তার জায়গায় নাম করেছে হালের কোম্পানি এডনা লরেঞ্জ। এদের দোকান হল চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে চৌরঙ্গী ম্যানসনে। আমরা দিদিমা মা মামা মাসিমা মামী মেসো মামাতো মাসতুতো ভাই-বোন সবশুদ্ধ আঠারো জন গিয়ে হাজির হলাম এডনা লরেঞ্জের দোকানে।

আগে থেকে বলা ছিল, তাই সাহেব গ্রুপ ছবি তোলার সব আয়োজন করেই রেখেছিল। প্রকাণ্ড হলঘরে পাশাপাশি চেয়ার রাখা হয়েছিল ছ'-খানা। তারই মাঝামাঝি একটায় বসলেন দিদিমা। পুরুষরা সকলেই সার বেঁধে পিছনে দাঁড়াল, মা মাসি মামীরা বাকি চেয়ারগুলোয় বসলেন, বড়-মামার অল্পবয়সী দুই মেয়ে বসল সামনে টুলে, আর আমি দাঁড়ালাম মা আর দিদিমার মাঝখানে। ঘরের মধ্যে ছবি তোলা হচ্ছে, ফ্ল্যাশ বা আলো ব্যবহার করবেন না সাহেবরা (হয়ত তখন রেওয়াজও ছিল না), এক পাশে জানালার সারি দিয়ে যা আলো আসছে তাতেই হবে। ঢাউস ক্যামেরা, লেন্সের সামনে ক্যাপ বসানো, সেই ক্যাপ হয়ত দু'সেকেন্ডের জন্য খুলে আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে, আর সেই দু'সেকেন্ডে ছবি উঠে যাবে। ওই সময়টুকুতে নড়াচড়া চলবে না।

সাহেব রেডি বলতে সবাই আড়ষ্ট হল, দৃষ্টি ক্যামেরার দিকে। যিনি ছবি তুলবেন, তার পাশে আরেকজন সাহেব, তার হাতে করতালওয়ালা সং-পুতুল, তার পেট টিপলে হাত দুটো খটাং খটাং করে করতাল বাজায়। এই পুতুলের দরকার আমার মেজোমামার ছোটছেলে বাচ্চুর জন্য। তার মাত্র কয়েক মাস বয়স, সে তার মায়ের কোলে বসেছে। তার দৃষ্টি যাতে ক্যামেরার দিকে থাকে, তাই সাহেব ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে করতাল

বাজাতে শুরু করলেন, আর সময় বুঝে অন্য সাহেব লেন্সের ক্যাপ খুলে আবার বন্ধ করে ছবি তুলে নিলেন।

এই ছবি তোলার বছর চার পাঁচের মধ্যে আমার দিদিমা, বড়মামা আর বড়মাসির ছেলে মানুদা মারা যান। এই একই গ্রুপ ফোটো থেকে এই তিন জনের ছবিই আলাদা আলাদা করে এনলার্জ করে দেন আমার ধনদাদু।

বকুলবাগানে আমাদের সঙ্গে থাকতেন আমার ছোট মাসি। তাঁর গাইয়ে হিসেবে খুব নাম ছিল। অবিশ্যি ছোটমাসির গান আমরা যেমন শুনেছি, তেমন কোনো বাইরের লোকে কোনোদিন শোনেনি, কারণ লোকের সামনে গাইতে গেলেই ছোটমাসির গলা শুকিয়ে যেত।

একদিন শুনলাম ছোটমাসির গান বেরোবে হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ডে, আর সেই গান রেকর্ড করার জন্য ছোটমাসিকে যেতে হবে গ্রামো-ফোন কোম্পানির আপিসে। ব্যবস্থাটা করেছেন বুলাকাকা। কলকাতার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গ্রামোফোনের দোকানের মালিক বলে বোধ হয় বুলাকাকার সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির বেশ খাতির ছিল।

বুলাকাকার লাল রঙের টি-মডেল ফোর্ড গাড়িতে করে মাসির সঙ্গে আমিও গেলাম কোম্পানির আপিসে। আপিস তখন বেলেঘাটায়; দমদমে যায় আরো পরে। সাহেব কোম্পানিতে গিয়ে গান দিতে হবে বলে দু'দিন থেকে মাসির ঘুম খাওয়া বন্ধ। ক্রমাগত আশ্বাস দিয়ে চলেছেন বুলাকাকা —কিচ্ছু ভয় নেই, ব্যাপারটা খুব সোজা, সব ঠিক হয়ে যাবে। বুলাকাকা নিজে কোনোদিন গানটান শেখেনি, তবে বাঁশিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়, আর দু'হাতে দারুণ অর্গ্যান বাজায়।

সাহেব কোম্পানির সাহেব ম্যানেজার, সাহেব রেকর্ডিস্ট। তখনকার দিনে মাইক্রোফোন ছিল না; একটা চোঙার দিকে মুখ করে গান গাইতে হত, সেই গান পাশের ঘরে ছাপা হয়ে যেত ঘুরন্ত মোমের চাকতির উপর।

ছোটমাসি সকাল থেকে যে ক' গেলাস জল খেয়েছে তার হিসেব নেই। ওখানে গিয়ে চোঙার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, আমি পাশের ঘরে কাচের জানালার পিছন থেকে ব্যাপারটা দেখছি। ছোকরা রেকর্ডিস্ট এসে চোঙা-টাকে নেড়েচেড়ে মাসিকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর মাসির সামনেই প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে লুফে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুলাকাকা

পরে বলেছিলেন কোনো মহিলা গাইয়ে এলেই নাকি রেকর্ডিস্ট তাঁদের দেখিয়ে দেখিয়ে এই ধরনের সব চালিয়াতি করেন। আমার বিশ্বাস সাহেবের সিগারেট জাগ্‌লিং দেখে মাসির গলা আরো শুকিয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক্‌, গান গাইলেন ছোটমাসি, শুনে বুঝতে পারছি আড়ষ্টভাব পুরো কাটেনি, তবে সেই গানই একদিন রেকর্ড হয়ে বাজারে বেরোল। তারপর অনেক দিন ধরে অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন ছোটমাসি। প্রথমে ছিলেন কনক দাশ; বিয়ের পরে হলেন কনক বিশ্বাস।

বকুলবাগানে আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ শ্যামানন্দ রোডে থাকতেন আমার মেজকাকা সুবিনয় রায়। এই কাকাই তখন একদিন নতুন করে বার করলেন সন্দেশ পত্রিকা। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে বাবা মারা যাবার পর বছর দুয়েকের মধ্যেই সন্দেশ উঠে যায়। তখনও আমার সন্দেশ পড়ার বয়স হয়নি। টাট্‌কা বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে হাতে নিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা হল এই দ্বিতীয় পর্বে। মলাটে তিনরঙা ছবি, হাতি দাঁড়িয়ে আছে দু'পায়ে, শুঁড়ে ব্যালান্স করা সন্দেশের হাঁড়ি। এই সন্দেশেই ধারাবাহিক ভাবে প্রথম সংখ্যা থেকে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের 'সে', আর এই সন্দেশেই প্রথম গল্প লিখলেন লীলা মজুমদার। ওনার গল্পের সঙ্গে মজার ছবিগুলো উনি তখন নিজেই আঁকতেন। অন্য আঁকিয়েদের মধ্যে ছিলেন এখনকার নাম-করা শৈল চক্রবর্তী, যাঁর হাতেখড়ি সম্ভবত হয় এই সন্দেশেই।

আরেকটা ছোটদের বাংলা মাসিক পত্রিকা তখন বেরোত যেটা বেশ ভালো লাগত, সেটা হল রামধনু। রামধনুর আপিস ছিল বকুলবাগান রোড আর শ্যামানন্দ রোডের মোড়ে, আমাদের বাড়ি থেকে দুশো গজ দূরে। এই কাগজের সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম, কারণ ওঁর লেখা জাপানী গোয়েন্দা হুকাকাশির গল্প 'পদ্মরাগ' আর 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি' আমার দারুণ ভালো লেগেছিল।

বকুলবাগানে থাকতেই প্রথম সাঁতার শিখতে যাই পদ্মপুকুরে ভবানীপুর সুইমিং ক্লাবে। তখন প্রফুল্ল ঘোষ সবে গায়ে চর্বি মেখে ৭৬ ঘণ্টা একটানা সাঁতার কেটে ওয়র্লড রেকর্ড করেছেন, আর প্রায় একই সময় ওয়র্লড চ্যাম্পিয়ন আমেরিকান সাঁতারু জনি ওয়াইসমুলার টার্জানের ভূমিকায় অভিনয় করে আমাদের তাক্‌ লাগিয়ে দিয়েছে। সুইমিং ক্লাবের ঘরে গিয়ে দেয়ালে ওয়াইসমুলারের সই করা বাঁধানো ছবি দেখে ক্লাব

সম্পর্কে ভক্তি বেড়ে গিয়েছিল। রবিবার সকালটা বেশ কয়েক বছর বাঁশ ধরে জলে পা ছোঁড়া থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে দিব্যি পুকুর এপার ওপার করে কেটেছে।

ছেলেবয়সে স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য ব্যায়ামের রেওয়াজটা আজকাল কতটা আছে জানি না, কিন্তু আমাদের সময় ছিল। সকালে ডন বৈঠক অনেকেই দিত। যারা শরীর নিয়ে একটু বেশি সচেতন তারা ডামবেল, চেস্ট্ এক্সপ্যান্ডারও বাদ দিত না। আমার নিজের ব্যায়ামের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়ের পাল্লায় পড়ে সেটা থেকে আর রেহাই পাইনি। ছোটদাদু নিজে দুর্গম পাহাড়ে জঙ্গলে জরীপের কাজ করেছেন, দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের জীবন। পুরুষের মধ্যে মেয়েলিপনা তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না; এমনকি রবীন্দ্রনাথের ঘাড় অবধি ঢেউ খেলানো চুলেও তাঁর আপত্তি। ছোটদাদুর অনেক ছেলে, সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়, সকলেই ব্যায়াম করে। আমি গিয়ে তাদের দল ভারী করলাম।

ব্যায়ামের কথাই যখন উঠল তখন এই ফাঁকে আমার যুযুৎসু শেখার ঘটনাটাও বলে নিই, যদিও সেটা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে, যখন আমি বকুলবাগান ছেড়ে চলে গেছি বেলতলা রোডে।

যুযুৎসু জিনিসটা প্রথম দেখি শান্তিনিকেতনে। তখন আমার বছর দশেক বয়স। গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলায়। নতুন অটোগ্রাফের খাতা কিনেছি, ভীষণ শখ তার প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে নেবো।

এক সকালে মা'র সঙ্গে গেলাম উত্তরায়ণে। খাতাটা দিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এটা থাক আমার কাছে; কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।'

কথা মতো গেলাম পরের দিন। টেবিলের উপর চিঠি-পত্র খাতা-বইয়ের ডাঁই, তার পিছনে বসে আছে রবীন্দ্রনাথ, আর আমায় দেখেই আমার ছোট্ট বেগুনী খাতাটা খুঁজতে লেগেছেন সেই ভীড়ের মধ্যে। মিনিট তিনেক হাতড়ানোর পরে বেরোল খাতাটা। সেটা আমায় দিয়ে মা'র দিকে চেয়ে বললেন, 'এটার মানে ও আরেকটু বড় হলে বুঝবে।' খাতা খুলে পড়ে দেখি আট লাইনের কবিতা, যেটা আজ অনেকেরই জানা—

বহু দিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।।

৭ই পৌষ ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেইবারই দেখলাম যুযুৎসু বা জুদোর নমুনা। প্রাচীন যুগে চীনের বৌদ্ধ লামারা দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য হাতিয়ার ছাড়া লড়াই ও আত্মরক্ষার এই কৌশলটা উদ্ভব করেছিল। চীন থেকে যায় জাপানে, তারপর জাপান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এই জুদো। রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়ে জুদো দেখে ঠিক করেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এই জিনিসটা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই জুদো এক্সপার্ট তাকাগাকি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে, আর জুদোর ক্লাস শুরু হয়ে যায়। কী কারণে জানি না, এই ক্লাস বছর চারেকের বেশি চলেনি। শেষে তাকাগাকি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়, আর বালিগঞ্জের সুইনহো স্ট্রীটে আমারই এক মেসোমশাই ডাঃ অজিতমোহন বোসের বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানে জুদো শেখানোর ব্যবস্থা করেন।

কথা নেই বার্তা নেই, ছোটকাকা সুবিমল রায় হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি এসে বললেন, 'জুদো শিখলে কেমন হয়?'

ছোটকাকাকে যারা দেখেছে তারাই জানবে যে ওঁর সঙ্গে ব্যায়াম বা কুস্তি বা ওই জাতীয় কোনো কিছুর কোনোরকম সম্বন্ধ কল্পনা করা কত কঠিন। রোগা পটকা আলাভোলা মানুষ, এম-এ পাশ করার পর থেকেই ইস্কুল মাস্টারি করছেন, এমন লোকের যুযুৎসু শেখার দরকারই বা হবে

কেন বা এমন ইচ্ছে মাথায় আসবেই বা কেন? কিন্তু সেই ইচ্ছেই একদিন দেখি ফলতে চলেছে, আর আমিও চলেছি ছোটকাকার সঙ্গে ট্রামে বালিগঞ্জে সুইনহো স্ট্রীটে জাপানী জুদো-নবিশের সঙ্গে কথা বলতে।

আজকের বালিগঞ্জ আর ১৯৩৪-এর বালিগঞ্জে যে কত তফাত সেটা যে না দেখেছে তার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে মহানির্বাণ মঠ ছাড়াবার পর পাকা বাড়ি প্রায় চোখেই পড়ে না, আর রাস্তার দু'পাশে আম জাম কাঁঠাল আর ঝোপঝাড় মিলিয়ে প্রায় পাড়াগাঁয়ের চেহারা!

গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে ডোবা বাঁশঝাড় তাল নারকেল ভরা মাঠ পেরিয়ে তবে সুইনহো স্ট্রীট। বোধহয় টেলিফোনে আগে থেকে জানানো ছিল, তাই মেশোমশাইদের বাড়ি খুঁজে বার করে একতলার বৈঠকখানায় বসে বেগুনী কিমোনো পরা জুদো-এক্সপার্ট তাকাগাকির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নিতে কোনো অসুবিধা হল না। ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ চল্লিশ, কুচকুচে কালো কদমছাঁট চুলের সঙ্গে মানানসই ঘন কালো ভুরু আর গোঁফ। আমার ধারণা ছিল ছোটকাকা জুদো শিখতে চান জেনে তাকা-গাকি হয়ত হেসেই ফেলবেন। কিন্তু সেরকম কিছু ত করলেনই না, বরং ভাব দেখালেন যে জুদোর ছাত্র হিসেবে ছোটকাকা একেবারে আইডিয়াল। কথাবার্তার পর দরজি এসে মাপ নিয়ে গেল জুদোর জামার জন্য। খদ্দর টাইপের পুরু সাদা কাপড়ের তৈরি জ্যাকেট, বেল্ট আর খাটো পায়জামা। জ্যাকেটের বুকের উপর কালো সুতোয় সেলাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা JUDO।

জামা তৈরি হলে পর দশ ইঞ্চি পুরো গদি বিছানো ঘরে জুদো শেখা আরম্ভ হল। প'য়তাল্লিশ বছর পরে জুদোর মাত্র দুটো প্যাঁচই এখনো মনে আছে—শেওই-নাগে আর নিপ্পন-শিও। শেখার শুরুতে খালি আছাড় খাও আর আছাড় মারো। চোট না পেয়ে কি করে আছাড় খেতে হয় এটা জুদোর একেবারে গোড়ার শিক্ষা। তাকাগাকি বলে দিয়েছিলেন—যখন পড়বে তখন শরীরটাকে একেবারে আলগা দিয়ে দেবে, তাহলে ব্যথা কম পাবে, আর হাড় ভাঙার সম্ভাবনাও কমে যাবে। আছাড় মানে একেবারে মাথার উপর তুলে আছাড়। জুদোর কায়দায় একটা বারো-তেরো বছরের ছেলেও যে একটা ধুমসো মানুষকে কত সহজে আছাড় মারতে পারে, সে এক অবাক করা ব্যাপার।
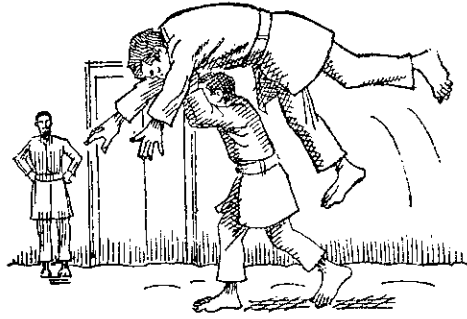
আমরা যেদিন শিখতাম সেদিন আরো দুটি ভদ্রলোক আসতেন—একজন বাঙালী, একজন সাহেব। বাঙালীটি আমাদের মতো শিক্ষানবিশ, আর সাহেবটি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের অধিবাসী আর্মির লোক Captain Hughes। ইনি বক্সিং-এ কলকাতার লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা, চোখাচোখা নাকমুখ, ছোট করে ছাঁটা ঢেউখেলানো সোনালি চুল। জুদোয় এঁর শেখবার কিছু ছিল না। ইনি নিজেই ছিলেন একজন এক্সপার্ট। কলকাতায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে ইনি তাকাগাকির সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়ে নিজের বিদ্যেটা একটু ঝালিয়ে নিতেন। সে লড়াই দেখবার জিনিস, আর আমরা দেখতাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। প্যাঁচের পর প্যাঁচ, আছাড়ের পর আছাড়, আর যে-কোনো একজন বেকায়দায় পড়লেই ডান হাত দিয়ে গদির উপর পর পর দুটো চাপড় মেরে জানিয়ে দেওয়া, আর অন্য জন তার প্যাঁচে আলগা দিয়ে তাকে রেহাই দেওয়া।

সবশেষে তাকাগাকি আমাদের খাওয়াতেন ওভালটিন, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে জংলা মাঠ পেরিয়ে ভবানীপুরের ট্রাম ধরে আমরা আবার ফিরে যেতাম যে যার বাড়ি।

উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণে চলে আসার ফলে বাপের দিকের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগ কমে গেলেও, ধনদাদু আর ছোটকাকা প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি। দাদু তখন কোন্যান ডয়েলের গল্প উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করছেন। পোষাকে সাহেবী ভাব, বরকত আলির দোকান থেকে স্যুট করান, বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোলে টাই পরে বেরোন। ট্রামের

মান্থ্লি টিকেট আছে, সপ্তাহে অন্তত তিনদিন আসেন আমাদের বাড়ি।

ভবানীপুরে থাকতেই দাদুর মুখে শুনেছিলাম পুরো মহাভারতের গল্প। এক-একদিনে এক-এক পরিচ্ছেদ। একটা বিশেষ ঘটনা দাদুকে দিয়ে অন্তত বার চারেক বলিয়েছি। তখন আমার মনে হত মহাভারতের সেটা সবচেয়ে গায়ে-কাঁটা দেওয়া ঘটনা। সেটা হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথ বধ। জয়দ্রথ কৌরবদের দিকের বড় যোদ্ধা। অর্জুন অনেক চেষ্টা করেও তাকে মারতে পারেনি। আজ সে প্রতিজ্ঞা করেছে জয়দ্রথকে না মারতে পারলে সে নিজে আগুনে পুড়ে মরবে। এই প্রতিজ্ঞার কথা কৌরবরাও শুনেছে। যুদ্ধ হয় সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সূর্য ডুবুডুবু, তখনও পর্যন্ত অর্জুন কিছু করতে পারেনি। এমন সময় অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ মন্ত্রবলে চারিদিক অন্ধকার করে সূর্যকে ঢেকে দিলেন। কৌরবরা দিনের শেষ ভেবে ঢিলে দিল আর সেই সুযোগে অর্জুন জয়দ্রথের মাথা উড়িয়ে দিল এক বাণে।

কিন্তু এখানেও মুশকিল। জয়দ্রথের বাবা রাজা বৃদ্ধক্ষত্র ছেলের জন্মের সময় দৈববাণী শুনেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর ছেলের মাথা কাটা যাবে। শুনে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন কাটা মুণ্ডু মাটিতে পড়লেই, যে ফেলেছে তার নিজের মাথা চৌচির হয়ে যাবে। এটা জানা ছিল বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—দেখো, জয়দ্রথের কাটা মাথা যেন মাটিতে না পড়ে; তাহলে তোমার মাথাও ফেটে যাবে। অর্জুন তাই এক বাণে জয়দ্রথের মাথা কেটে সেটা মাটিতে পড়ার আগেই পর পর আরো ছ'টি বাণ মেরে সেটা শূন্যে উড়িয়ে বহুদূর নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল জয়দ্রথের তপস্যারত বুড়ো বাপ বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে। বৃদ্ধক্ষত্র নিজের ছেলের মাথা কোলে দেখেই চমকে উঠে দাঁড়ানোমাত্র কাটা মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

দাদুর কাছে যেমন মহাভারতের গল্প শুনতাম, তেমনি ছোটকাকার কাছে শুনতাম ভূতের গল্প। এই ছোটকাকার বিষয় অল্প কথায় বলা মুশকিল, কারণ ঠিক ছোটকাকার মতো আরেকটি মানুষ আর আছে কিনা সন্দেহ।

ছোটকাকা মাস্টারি করতেন সিটি স্কুলে। খাটো ধুতি, ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, হাতে ছাতা আর পায়ে ব্রাউন ক্যাম্বিসের জুতো দেখলে পেশাটা আন্দাজ করা যেত। ছোটকাকা বিয়ে করেননি। একা মানুষ বলেই বোধহয় ছোটকাকার কাজ ছিল হেঁটে বা বাসে পালা করে চতুর্দিকের
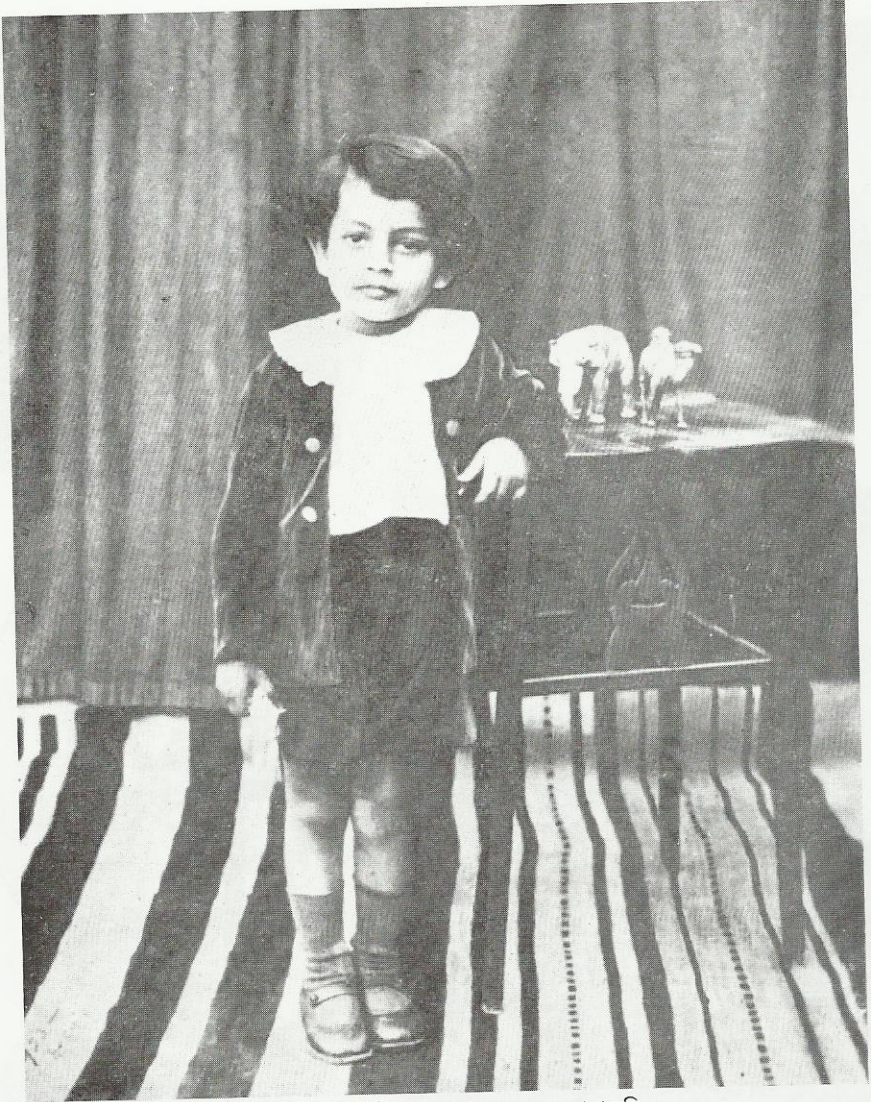
বাবা মারা যাবার কিছু আগে দু'বছর বয়সে তোলা ছবি।

ডাইনে—চার বছর বয়সে তোলা ছবি।
নিচে—ঠাকুরমা, আমি আর আমার
চেয়ে চার বছরের বড় খুড়তুতো
দাদা সরল।

১৯২৩ ডিসেম্বরে তোলা ছবি।

উপরে—চার বছর বয়সে তোলা ছবি।
ডাইনে ও নিচে—১৯২৫-এ আমার
খাতায় নন্দলাল বসুর আঁকা ভাল্লুক
ও বাঘের ছবি।
মূল ছবিগুলি রঙীন।
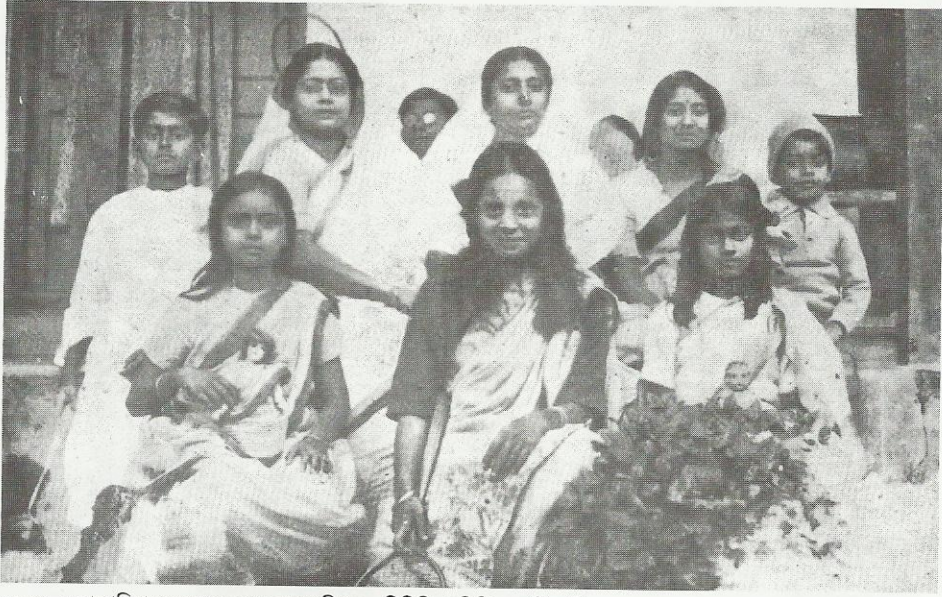
১৯২৫-এ হাজারিবাগে তোলা। সামনের সারিতে—নিনিদি, রুবিদি ও লতিকাদি।
পিছনের সারিতে—কল্যাণদা, মেজোপিসিমা, বীণাদি অমল হোমের বোন ও আমি।
নিচে—নিনিদিকে লেখা চিঠি।

154/1/1 D Bakul Bagan
Rd Bhawanipur
12.12.28

নিনি দিদি, আমরা এখানে
পরশু এসে পৌঁছেছি।
এখানে এসে আমার
একটুও মজা লাগছে না।
ওখানে বেশ মজা হত
না? তোমরা কি এখন
আর বেড়াতে যাও?

ডলি দিদি আর কল্যানদাদা
কে বোলো যে আমি আজকে
ওদের চিঠি লিখতে
পারলাম না। আর কিছু
খবর ভেবে পেলাম না।
চিঠি উত্তর দিও। ভুলো না।
ইতি
মানিক

রাজকে যদি পারো,
(তবে) অকারণ না কোরো
ভাবনা আর।
হাসির আলো
বিদায় এলো;
দুঃখ হয় পার।
ভাবনা রাখো
হাসতে শেখো
আমার মতন দাঁত-ফুলে,
হাসতে শেখো,
হাসতে শেখো
দুঃখ বিদায় সব ভুলে।
৭/১০/২৯

সবুজ পাতায় ফুল
সুন্দর যেমন,
তেমনি সুন্দর হোক
তোমার জীবন।
পরের কারণে তুমি
ছড়িয়ো সুবাস
সফল হউক তব
এই মনে আশা।

৬ আশ্বিন ১৩৩৬
আগ্রা।

সাত রাজার ধন মানিক যেমন আঁধার গৃহ আলো করে,
তোমার ঐ মধুর হাসি যেন সবার প্রাণের আঁধার হরে।

মেজপিসীমা

২১শে আশ্বিন ১৩৩৬

আমার অটোগ্রাফের খাতা থেকে।
(ডাইনে লীলুপিসির আঁকা ছবি)

আন্দাজ ১৯২৮-এ লখ্‌নৌতে তোলা ছবি। সামনের সারিতে আমি, মা (কোলে বাচ্চু), মণ্টু, মেজোমামি (কোলে সোনামামির ছেলে বাবলু)। পিছনের সারিতে সোনামামি, মেজোমামা, ছোটমাসি।

ছোটমাসি কনক দাশ
(পরে বিশ্বাস) ১৯২৮

সোনামামা প্রশান্তকুমার
দাশ (১৯২৬)

দার্জিলিং-এ অবিনাশ মেসোমশাই ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমি (বাঁ দিক থেকে চতুর্থ)।

বুলাকাকা
একসঙ্গে পর পর তোলা আটটা

ছবির একটা (১৯৩২)।

ছোটকাকা সুবিমল রায়।

ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায়।
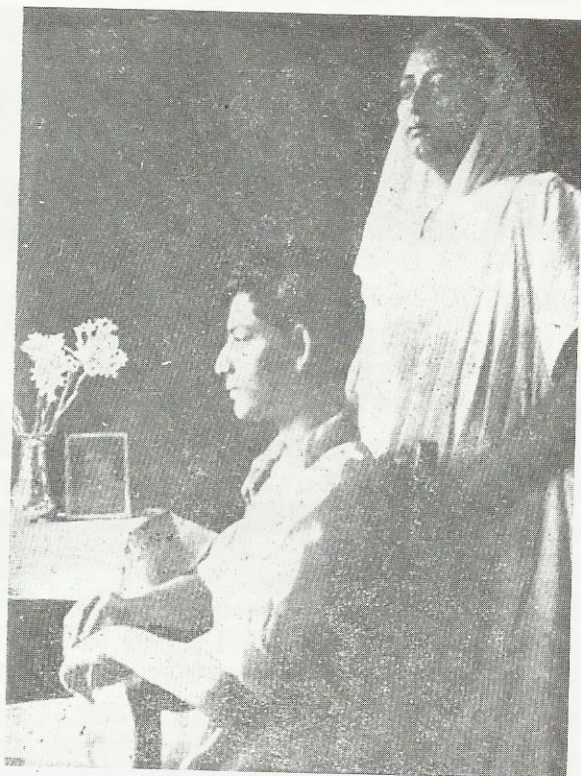
মা আর আমি। ক্যামেরার শাটারের সঙ্গে সুতো
বেঁধে আমিই টান দিয়ে তুলেছিলাম ছবিটা।
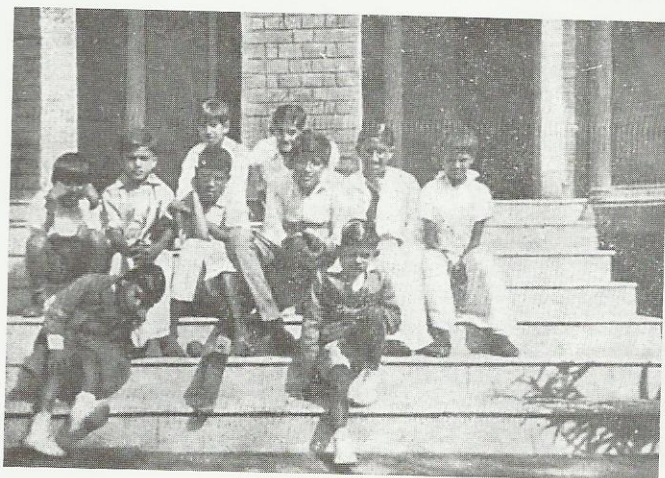
বেলতলা রোডে আমাদের ক্লাবের কিছু
ছেলে। ১৯৩৪-এ আমার বক্স ক্যামেরায়
তোলা। মাঝের সারিতে বাঁদিক থেকে
চতুর্থ জন হল মানু (সিদ্ধার্থশঙ্কর
রায় (মানুর ডাইনে পানু)।

লঞ্চ থেকে নেমে নৌকো করে খাল ধরে জঙ্গল দেখতে যাওয়া।

সমুদ্রে স্নান।

আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে তাদের খবর নেওয়া। আমার বিশ্বাস আমাদের বিরাট ছড়ানো রায় পরিবারের সব্বাইকে একমাত্র ছোটকাকাই চিনতেন।

মজার মানুষের স্বপ্নগুলোও মজার হয় কিনা জানি না। ছোটকাকার স্বপ্নের কথা শুনে তাই মনে হত। একবার স্বপ্ন দেখলেন এক জায়গায় খুব জাঁকিয়ে কীর্তন হচ্ছে। কিছুক্ষণ শুনে বুঝলেন গানের কথা শুধু একটিমাত্র লাইন—'সত্য বেগুন জ্বলে'। কী ভাবে এই লাইনটা গাওয়া হচ্ছিল সেটাও ছোটকাকা নিজে গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আরেকটা স্বপ্নে দেখলেন কলকাতার রাস্তায় প্রোসেশান বেরিয়েছে। মানুষের নয়, বাঁদরের। তাদের হাতে ঝাণ্ডা, আর তারা স্লোগ্যান দিতে দিতে চলেছে—'তেজ চাই! তেজ চাই! আফিঙে আরো তেজ চাই!'

আত্মীয়দের অনেককেই ছোটকাকা তাঁর নিজের দেওয়া নামে ডাকতেন। তাই শুধু না, তাদের বিষয় কিছু বলতে গেলেও সেই নামেই বলতেন। বার বার ছোটকাকার মুখে শুনে শুনে সে সব নাম আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা জানতাম 'ডিডাক্স' হচ্ছেন ধনদাদু; Voroid হচ্ছেন মেজোপিসেমশাই, 'ওয়্যাং' হচ্ছে ধনদাদুর মেয়ে তুতুপিসি, 'গোগ্রিল' হচ্ছে ধনদাদুর ছেলে পানকুকাকা, ছোট কুসুমপুয়া আর বড় কুসুমপুয়া হল আমার পিসতুতো বোন নিনিদি আর রুবিদি, বজ্র বৌঠান হচ্ছেন মা, নুলমুলি হচ্ছি আমি। কখন কেন কীভাবে এই নামকরণ হয়েছে তা কেউ জানে না। একবার জিজ্ঞেস করছিলাম পিসেমশাইয়ের নাম Voroid হল কেন। তাতে ছোটকাকা গম্ভীর ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'উনি খুব ভোরে ওঠেন তাই।' নিজে বাড়াবাড়ি রকম ধার্মিক না হলেও, সাধু সন্ন্যাসী-দের সম্পর্কে ছোটকাকার একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল। তাঁদের জীবনী পড়তেন, আর জীবিতদের মধ্যে যাঁদের উপর ছোটকাকার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁরা শহরে এলেই তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসতেন। তিব্বতী বাবা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সন্তদাস বাবাজী, রামদাস কাঠিয়া বাবা—এই সব সাধুদের সম্বন্ধে কত গল্পই না শুনেছি ছোটকাকার কাছে।

একা মানুষ, নিজের ধান্দায় থাকেন, অল্পেই সন্তুষ্ট, তাই ছোটকাকাকেও মাঝে মাঝে এক রকম সন্ন্যাসী বলেই মনে হত। তাছাড়া ওঁর কিছু বাতিক ছিল যেটা সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। মুখে গ্রাস নিয়ে বত্রিশবার চিবোনর কথা ত আগেই বলেছি; সকালে মুখ ধোবার সময় বেশ কিছুক্ষণ চলত নাক দিয়ে জল টেনে মুখ দিয়ে বার করা। এটার নাম ছিল

নাকী মুদ্রা। এটা ছাড়া কাকী মুদ্রা বলেও একটা ব্যাপার ছিল, সেটা যে কী তা আর মনে নেই। বিকেলে শবাসন করে শুয়ে থাকতেন বেশ কিছুক্ষণ, আর তার পরেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

খাওয়া, বিশ্রাম, কাজ, বেড়ানো, গল্প করা—সব কিছুরই ফাঁকে ফাঁকে চলত ছোটকাকার ডায়রি লেখা। এটা জোর দিয়ে বলতে পারি যে এমন ডায়রি কেউ কোনো দিন লেখেনি। এতে থাকত সকালে কাগজে পড়া জরুরী খবরের শিরোনাম থেকে শুরু করে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় কী করলেন, কী পড়লেন, কী খেলেন, কোথায় গেলেন, কী দেখলেন, কে এল—সব কিছুর বিবরণ। ট্রেনে করে বাইরে গেলে এনজিনের কী 'টাইপ' সেটাও লিখে রাখতেন। এনজিনের যে শ্রেণীবিভাগ হয় সেটাও ছোটকাকার কাছেই প্রথম জানি। XP, HPS, SB, HB—এসব হল টাইপের নাম। তখনকার দিনের কয়লার এনজিনের গায়েই সেটা লেখা থাকত। কোথাও যেতে হলে ছোটকাকা স্টেশনে হাজির হতেন হাতে খানিকটা সময় নিয়ে, কারণ কামরায় মাল তুলেই ঝট্ করে গিয়ে এনজিনের টাইপ জেনে আসতে হবে। যদি কোনো কারণে দেরি হয়ে যেত, তাহলে প্রথম বড় জাংশন এলেই কামরা থেকে নেমে সে কাজটা সেরে আসতেন।

এই ডায়রি লেখা হত চার রকম রঙের কালিতে—লাল, নীল, সবুজ আর কালো। একই বাক্যে চার রকম রঙই ব্যবহার হচ্ছে, এই নমুনা ছোট-কাকার ডায়রিতে অনেক দেখেছি। এই রঙ বদলের একটা নিয়ম ছিল, তবে সেটা কোনোদিনই আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়নি। এইটুকু জানতাম যে প্রাকৃতিক বর্ণনা সবুজ কালিতে লেখা হবে, আর বিশেষ্য হলে তাতে লাল কালি ব্যবহার হবে। যেমন, 'আজ তুমুল বৃষ্টি। মানিকদের বাড়ি যাওয়া হল না'—এই যদি হয় দুটো পর পর বাক্য, তাহলে প্রথমটা লেখা হবে সবুজ কালিতে, দ্বিতীয়টার প্রথম দুটো কথা হবে লাল, আর বাকিটা কালো কিম্বা নীল। খাটের উপর চৌকি, আর তার উপরে কালি কলমের দোকান সাজিয়ে যখন ভীষণ মনোযোগ দিয়ে ছোটকাকা ডায়রি লিখতেন, তখন সেটা হত একটা দেখবার মতো জিনিস।

এখানে ডায়রির আরেকটা জিনিসের কথা না বললেই নয়।

ছোটকাকা পেটুক না হলেও, খেতেন খুব তৃপ্তি করে। রোজ এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে চা খাওয়ার ব্যাপারটা ছিল একটা বিশেষ ঘটনা। ডায়রিতে এর উল্লেখ থাকত, তবে মামুলিভাবে নয়। যে চা-টা খেলেন তার একটা

বিশেষণ, আর ব্র্যাকেটের মধ্যে সেই বিশেষণের একটা ব্যাখ্যা চাই।

একমাসের ডায়রি থেকে বারোটা উদাহরণ দিচ্ছি। ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে—

১) নৃসিংহভোগ্য চা (ভৈরবকান্তি-জনক, হুহুঙ্কার প্রসাদক, জোরালো চা)

২) বৈষ্ণবভোগ্য চা (নিরীহ, সুমিষ্ট, সুকোমল, অহিংসক চা)

৩) বিবেকানন্দভোগ্য চা (কর্মযোগস্পৃহাবর্ধক, বাগ্‌বিভূতিপ্রদ, তত্ত্বনিষ্ঠার অনুকূল উপাদেয় চা)

৪) ভট্টাচার্যভোগ্য চা (বিজ্ঞতাবর্ধক, গাম্ভীর্যপ্রদ, অনুগ্র, হৃদ্য চা)

৫) ধন্বন্তরিভোগ্য চা (আরোগ্যবর্ধক, আয়ুষ্য, রসায়ণগুণ-সম্পন্ন চা)

৬) পাহারাদারভোগ্য চা (সতর্কতাবর্ধক, উত্তেজক, তন্দ্রানাশক চা)

৭) মজলিসী চা (মস্‌গুল-মস্‌গুল ভাবোদ্রেককারী চা)

৮) কেরাণিভোগ্য চা (হিসাবের খাতা দেখায় উৎসাহবর্ধক, বাদামী, স্বাদু চা)

৯) হাবিলদারভোগ্য চা (হিম্মৎপ্রদ, হামবড়াভাবের প্রবর্তক চা)

১০) জনসাধারণভোগ্য চা (বৈশিষ্ট্যহীন, চলনসই চা)

১১) নারদভোগ্য চা (সঙ্গীতানুরাগবর্ধক, তত্ত্বজ্ঞানপ্রসাদক, ভক্তি-রসোদ্দীপক চা)

১২) হনুমানভোগ্য চা (বিশ্বাসযোগ্যতাবর্ধক, সমস্যা-সমুদ্রলঙ্ঘনের শক্তিদায়ক, বিক্রমপ্রদ চা)।
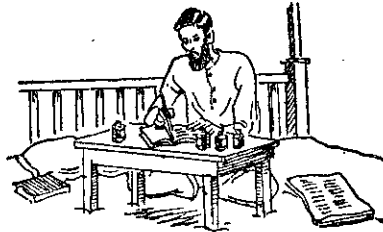
ছুটিতে বাইরে

গড়পার থেকে ভবানীপুর আসার দু-এক বছরের মধ্যেই মা বিধবাদের ইস্কুল বিদ্যাসাগর বাণীভবনে চাকরি নেন। তার জন্য মা-কে বাসে করে রোজ সেই গড়পারেরই কাছাকাছি যেতে হত। আমার পড়াশুনার ভারও তখন মায়েরই উপর; আমি ইস্কুলে ভর্তি হই ন'বছর বয়সে। গ্রীষ্মে আর পুজোয় মা'র যখন ছুটি হত, তখন আমরা দুজন মাঝে মাঝে বাইরে যেতাম চেঞ্জে।

এর আগে গড়পারে থাকতে বাবা মারা যাবার পরও বারকয়েক বাইরে গেছি, তার মধ্যে দুবারের কথা অল্প অল্প মনে আছে।

একবার লখ্‌নৌ গিয়ে কিছুদিন মা'র মাসতুতো ভাই অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ি, আর কিছুদিন অতুলপ্রসাদের বোন ছুটকি মাসির বাড়ি ছিলাম। অতুলমামার বাড়িতে খুব গান বাজনা হত সেটা মনে আছে। অতুলমামা নিজে গান লিখতেন, সে গান মাকে শিখিয়ে মা'র একটা কালো খাতায় লিখে দিতেন। তখন রবিশঙ্করের গুরু আলাউদ্দীন খাঁ অতুলমামার বাড়িতে ছিলেন আর মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজাতেন। একদিন এলেন তখনকার নামকরা গাইয়ে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার। তিনি গেয়ে শুনিয়েছিলেন বিখ্যাত ভৈরবী 'ভবানী দয়ানী' সেটা পরিষ্কার মনে আছে। এই গান ভেঙে অতুলমামা লিখলেন 'শুন সে ডাকে আমারে'।

একদিন অতুলমামা আর মা'র সঙ্গে আমাকে যেতে হল এক বক্তৃতা শুনতে। ওস্তাদী গানের বিষয় বক্তৃতা, তার উপর আবার ইংরিজিতে। আমি বার বার ঘুমে ঢুলে পড়ছি, আর তারপর অভদ্রতা হচ্ছে বুঝতে পেরে (কিম্বা মায়ের ধমক খেয়ে) জোর করে সোজা হয়ে বসে চোখ খুলে রাখতে চেষ্টা করছি। তখন কি আর জানি যে যিনি বক্তৃতা করছেন তাঁর নাম বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, আর তাঁর মতো সংগীত বিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মেছে?

ছুটকি মাসির বাড়িতে খুব একটা জমেনি এই কারণে যে মেসোমশাই শ্রীরঙ্গম দেশিকাচার শেষাদ্রি আয়াঙ্গার ছিলেন মাদ্রাজি, আর তাঁর তিন ছেলেমেয়ে, আমার মাসতুতো ভাইবোন অমরদা, কুন্তুদি আর রমলাদি, কেউই বাংলা বলত না বা জানত না। আমাকে তাই বেশির ভাগ সময়ই মুখ বন্ধ করে তাদের গড়গড় করে বলা ইংরিজি শুনতে হত। শুধু সন্ধেবেলা 'হ্যাপি ফ্যামিলি' বলে একটা খেলা খেলার সময় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতাম।

সেবার লখনৌতে ছোটমাসিও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। যাবার সময় না আসবার সময় মনে নেই, মা আর মাসি উঠে গেলেন ইণ্টারক্লাস লেডিস কামরায়; আমার সেখানে জায়গা হল না বলে আমাকে কোনরকমে উঠিয়ে দেওয়া হল পাশের এক সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। উঠে দেখি কামরা বোঝাই লালমুখো সাহেব মেম। আমার বুক ধুক্‌পুক্। মুখে রা নেই, উঠে পড়েছি, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, নামতেও পারি না। কী আর করি, একটা কোণে মেঝেতে বসে রইলাম চুপটি করে সারারাত। সাহেবরা যদি আমায় বসতে দিতে চেয়েও থাকে, তাদের ইংরিজি বোঝার সাধ্যি ছিল না আমার। আমার ধারণা তারা আমাকে গ্রাহ্যই করেনি।

লখনৌতে পরেও গিয়েছি বেশ কয়েকবার। মেজোমামা ছিলেন ওখানকার ব্যারিস্টার। তাঁর দুই ছেলে মণ্টু বাচ্চু আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও আমার খেলার সাথী। শহরটার উপরেও একটা টান পড়ে গিয়েছিল। নবাবদের শহরের বড়া ইমামবড়া, ছোটা ইমামবড়া, ছত্তর মঞ্জিল, দিলখুশার বাগান—এসব যেন মনটাকে নিয়ে যেত আরব্যোপন্যাসের দেশে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত বড়া ইমামবড়ার ভিতরের গোলকধাঁধা ভুলভুলাইয়া। গাইড সঙ্গে না থাকলে ভিতরে ঢুকে আর বেরোন যায় না। গাইড গল্প করত একবার এক গোরা পল্টন নাকি বড়াই করে একাই ঢুকেছিল গোলকধাঁধার ভিতরে। তারপর বাইরে বেরোবার পথ না পেয়ে সেখানেই থেকে যায়, আর না খেতে পেয়ে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। রেসিডেন্সির ভগ্নস্তূপের দেয়ালে কামানের গোলার গর্তে সিপাহী বিদ্রোহের চেহারাটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম। মার্বেলের ফলক বলছে—এই ঘরে অমুক দিন অমুক সময়ে কামানের গোলায় স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু হয়। ইতিহাস ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এই লখনৌকে পরে আমি গল্পে আর ফিল্মে ব্যবহার করেছি। ছেলেবেলার স্মৃতি আমার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল।

প্রথমবার লখ্‌নৌ যাবার পরেই মা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। সেবার গিয়ে মাস তিনেক ছিলাম। তখন আমার খেলার সাথী ছিল রথীন্দ্র-নাথের পালিত মেয়ে পুপে। দুজনের বয়স কাছাকাছি; রোজ সকালে পুপে চলে আসত, আমাদের ছোট কুটিরে ঘণ্টা খানেক খেলা করে চলে যেত। তখন শান্তিনিকেতনের চারিদিক খোলা। আশ্রম থেকে দক্ষিণে বেরোলেই সামনে দিগন্ত অবধি ছড়ানো খোয়াই। পূর্ণিমার রাতে খোয়াইতে যেতাম আর মা গলা ছেড়ে গান গাইতেন।

মা-ই আমাকে একটা ছোট্ট খাতা কিনে দিয়েছিলেন যেটা নিয়ে মাঝে মাঝে চলে যেতাম কলাভবনে। নন্দলালবাবু সে খাতায় চার দিনে চারটে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন আমায়। পেনসিলে গরু আর চিতাবাঘ, রঙ তুলি দিয়ে ভাল্লুক আর ডোরাকাটা বাঘ। বাঘটা এঁকে সব শেষে ল্যাজের ডগায় তুলির একটা ছোপ লাগিয়ে সেটা কালো করে দিলেন। বললাম, 'ওখানটা কালো কেন?' নন্দলালবাবু বললেন, 'এই বাঘটা ভীষণ পেটুক। তাই ঢুকেছিল একটা বাড়ির রান্নাঘরে মাংস চুরি করে খেতে। তখনই ল্যাজের ডগাটা ঢুকে যায় জ্বলন্ত উনুনের ভেতর।'

বছর সাতেক বয়সে প্রথম গেলাম দার্জিলিং। থাকব তিন মাসির বাড়ি পালা করে। ক'দিন থাকব তার ঠিক নেই। মনে আছে যাবার পথে ভোরে ট্রেনে যখন ঘুম ভাঙল, আর জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম হিমালয়, তখন মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিলিগুড়িতে মোটর গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়ামাসিমা, কারণ তাঁর বাড়িতেই থাকব প্রথম। ড্রাইভার বাঙালী ভদ্রলোক। এঁকেবেঁকে পথ উপরে উঠে চলেছে পাহাড়ের গা দিয়ে। যতই উপরে উঠছি ততই মেঘ আর কুয়াশা বাড়ছে আর ততই জোরে গাড়ি চালাচ্ছেন আমাদের ড্রাইভার। বললেন তাঁর নাকি পুরো রাস্তার প্রত্যেকটি মোড় নখদর্পণে, তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

মায়ামাসিমার স্বামী অজিত মেসোমশাই দার্জিলিং-এর নাম-করা ডাক্তার (এঁরই কলকাতার বাড়িতে আমি যুযুৎসু শিখতে যেতাম), আর মাসতুতো ভাই দিলীপদা আমার চেয়ে বছর পাঁচেক বড়ো, নেপালী বলে একেবারে নেপালীদের মতো, বাড়ির গেটের ধারে পা ছড়িয়ে বসে নেপালী-দের সঙ্গে তাস খেলে, আর ঘোড়া ছোটায় যেন চেঙ্গিস খাঁ। দিলীপদা পরে দার্জিলিং-এর লেবং রেসের মাঠে কিছুদিন জকি ছিল। সম্ভবতঃ

দার্জিলিং-এর ইতিহাসে একমাত্র বাঙগালী জকি।

দিলীপদার সঙ্গে ক্যারাম খেলাটা জমত ভালো, আর দিলীপদার কাছে ছিল একগাদা কমিকস বই। কমিকসের ভক্ত আমি খুব ছেলেবেলা থেকেই। আমার জ্বর হলেই মা নিউ মার্কেট থেকে চার আনা দিয়ে দুটো নতুন কমিকস এনে দিতেন—তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগত 'কমিক কাটস' আর 'ফিল্ম ফান'।

মায়ামাসির বাড়ি থেকে গেলাম মনুমাসির বাড়ি। এই মাসির স্বামী হলেন সেই মেসোমশাই, যাঁর ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে সোনামামা কাজ করতেন। বাড়ির নাম এলগিন ভিলা, বাড়ির সামনে পাহাড়ের মাথা চেঁছে তৈরি করা টেনিস মাঠ; মেসোর সঙ্গে তাঁর ছেলেরাও টেনিস খেলে।

এই মেসোর বিষয় একটু আলাদা করে বলা দরকার, কারণ ছেলেবেলার আমাদের স্মৃতির অনেকটাই এঁর কলকাতায় আলিপুরে নিউ রোডের বিশাল বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

অবিনাশ মেসোমশাই একেবারে কেরানি অবস্থা থেকে বিরাট এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মালিকের পদ অবধি উঠে-ছিলেন। তখন তিনি হাবভাবে একেবারে সাহেব; তাঁকে দেখে তাঁর প্রথম অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব। মেসোর ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, তার মধ্যে বড় ছেলে অমিয় আমার সোনামামার বন্ধু। দু'জনকে এক সঙ্গে মুগার সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছি বকুলবাগানের ছাত থেকে, যদিও ঘুড়ি ওড়ানোর বয়স তখন ওঁদের নয়, আমার। নিউ রোডের বাড়িতে বিয়ে হলে যা ধুমধাম হত, তেমন আমি আর কোথাও দেখিনি। শুধু লোকজন খাওয়ানো নয়, সেই সঙ্গে আমোদের ব্যবস্থাও থাকত। একবার বড় মেয়ের বিয়েতে মেসো ব্যবস্থা করলেন প্রোফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কমিকের। সেই সময়ে কলকাতার সবচেয়ে নামকরা কমিক অভিনেতা ছিলেন গোস্বামী মশাই। এ জিনিসটা আজকাল ক্রমে উঠে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক ধরে একজন লোক নানান রংতামাসা করে দর্শককে জমিয়ে রাখবে, এমন ক্ষমতা আজ আর কারুর নেই। চিত্তরঞ্জন গোস্বামী সেটা অনায়াসে পারতেন। আলি-পুরের বিয়েতে তাঁর একটা কমিক আমার এখনো মনে আছে, তার কারণ সেটা শুনে আমার লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কথা মনে হয়েছিল।

'রাবণ আসিল যুদ্ধে প'রে বুট জুতো

(আর) হনুমান মারে তারে লাথি চড় গুঁতো—
(নামের কী মহিমা, রামনামের কী মহিমা!)'

এই দিয়ে শুরু, আর শেষের দিকে ছিল—

গ্যাঁক্ করে বিঁধল বাণ দশাননের বুকে
বাপ্‌রে বাপ ডাক ছাড়ে ধুঁয়ো দেখে চোখে
(নামের কী মহিমা!)
বিশ হাতে পটল তোলে, দশ মুখে বাজে শিঙে
দেখতে দেখতে রাবণ রাজা তুলে ফেলল ঝিঙে।
(নামের কী মহিমা!)

এ জিনিস অবশ্য চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর মতো কেউ গাইতে পারবে না। কমিক দেখিয়ে আমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দিয়ে সব শেষে ভদ্রলোক টপাটপ্ খেয়ে ফেললেন উনিশটা রসগোল্লা।

অবিনাশ মেসোমশাইর একটা আলিসান ইটালিয়ান গাড়ি ছিল যার নাম ল্যানসিয়া। গাড়ি যখন চলত তখন বনেটের ডগায় দপ্ দপ্ ক'রে গোলাপী আলো বেরোত একটা কাচের ফড়িং-এর গা থেকে।

আমরা যখন দার্জিলিং গেছি, মা'র তখনো কলকাতার চাকরি হয়নি। দার্জিলিঙে কিছুদিন থাকার পরেই হঠাৎ মাস্টারির চাকরি নিয়ে ফেললেন মহারানী গার্লস স্কুলে, আর সেই সঙ্গে আমিও সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। অদ্ভুত ইস্কুল, ক্লাসে ক্লাসে ভাগ নেই; আমি একটা বড় হলঘরের এক জায়গায় বসে পড়ছি, দূরে ওই কোণে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা ক্লাসে মা অঙ্ক কষাচ্ছেন। ক'দিন পড়েছিলাম স্কুলে তা মনে নেই। সত্যিই কিছু পড়েছিলাম, না চুপচাপ বসিয়ে রাখা হত আমাকে যতক্ষণ না মা'র ছুটি হয় তাও মনে নেই।

এদিকে মনটা ভারী হয়ে আছে, কারণ মেঘ আর কুয়াশার জন্য এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা হয়নি। কলকাতার বাড়ির দেয়ালে টাঙানো আছে ঠাকুরদাদার আঁকা রঙীন কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি; মন ছটফট করছে মিলিয়ে দেখার জন্য ছবির কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে আসল কাঞ্চনজঙ্ঘা। অবশেষে এলগিন ভিলাতে একদিন ভোরবেলা মা ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। ছুটে গেলাম জানালার ধারে।

ঠাকুরদাদার ছবিতে ছিল বরফের উপর বাঁ দিক থেকে পড়ছে বিকেলের

রোদ, আর এখন চোখের সামনে দেখছি ডানদিক থেকে রঙ ধরা শুরু হয়েছে।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম যতক্ষণ না সূর্যের রঙ গোলাপী থেকে সোনালী, সোনালী থেকে রুপালী হয়। এর পরে নিজের দেশে আর বাইরে পৃথিবীর বহু দেশে বহু নাম করা সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি।

ছুটিতে বাইরে সবচেয়ে বেশি ফুর্তি হত মেজোপিসিমার বাড়িতে। পিসেমশাই ছিলেন সদর ডেপুটি অফিসার। তাঁর কাজের জায়গা ছিল বিহার। বদলির চাকরি—কখনো হাজারিবাগ, কখনো দ্বারভাঙ্গা, কখনো মজঃফরপুর, কখনো আরা—এইভাবে ঘুরে ঘুরে কাজ। আমি যখন প্রথম যাই ওঁদের কাছে তখন ওঁরা ছিলেন হাজারিবাগে। পিসিমার দুই মেয়ে—নিনি আর রুবি, আর তাদের বাপ-মা-হারা খুড়তুতো ভাই বোন কল্যাণ আর লতু। সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড় আর সবাই আমার বন্ধু।

হাজারিবাগে এর পরে আরো কয়েকবার গেছি। প্রথম বার যাওয়া থেকে মনে আছে পিসেমশাই-এর সবুজ রঙের ওভারল্যান্ড গাড়ি। তখনকার গাড়ির লট্‌খটে চেহারা দেখে এখনকার লোকের হাসি পাবে, কিন্তু এই ওভারল্যান্ড যে কত তাগড়াই গাড়ি ছিল, আর কত ঝঞ্ঝার মধ্যেও সে তার বাহনের কর্তব্য পালন করে এসেছে সেটা পিসেমশাই-এর মুখে শুনতাম।

এই গাড়িতে করেই আমরা গিয়েছিলাম রাজরাপ্পা। হাজারিবাগ থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে ভেড়া নদী পেরিয়ে মাইল খানেক হাঁটার পর রাজরাপ্পা। সেখানে গা ছমছম করা ছিন্নমস্তার মন্দিরকে ঘিরে দামোদর নদীর ওপর জলপ্রপাত, বালি, দূরের বন আর পাহাড় মিলিয়ে অদ্ভুত দৃশ্য।

ফেরার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল ব্রাহ্মণবেড়িয়া পাহাড়ের ধারে। পাহাড়ে নাকি অনেক বাঘ ভাল্লুক। গাড়ি সারাতে সারাতে রাত হয়ে গেল, কিন্তু বাঘ ভাল্লুকের দেখা পেলাম না।

গাড়িতে কোথাও যাবার না থাকলে সবাই মিলে হেঁটে বেড়াতে বেরোতাম সন্ধ্যাবেলা। ফিরতাম খাবার সময়ের ঠিক আগে। টিমটিমে লণ্ঠন আর কেরোসিন ল্যাম্পের আলো, তার মধ্যে বসে গল্প আর খেলা দারুণ জমত। তাসের খেলা ছিল 'আয়না মোহর' আর 'গোলাম চোর'। গোলাম চোর

সকলেই জানে, কিন্তু আয়না মোহর খেলা আর কাউকে কখনো খেলতে দেখিনি। আর সে খেলার যে কী নিয়ম সেটাও আজ আর মনে নেই।

অন্য খেলার মধ্যে একটা মজার খেলা ছিল 'হুইস্পারিং গেম'। পাঁচ জনে গোল হয়ে বসে খেলা। একজন তার বাঁয়ের লোকের কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে একটা কথা বলল। একবারের বেশি বলা চলবে না। সেই একবারে বাঁয়ের লোক যা শুনল, সেটাই সে তার বাঁয়ের লোককে বলল। এই ভাবে কান থেকে কান ঘুরে কথা আবার যে শুরু করেছিল তার কানেই ফিরে এল। মজাটা হচ্ছে কথা শেষ পর্যন্ত কী-তে দাঁড়াল তাই নিয়ে। আমি একবার শুরু করে বাঁয়ের লোকের কানে বললাম 'হারাধনের দশটি ছেলে।' সেটা যখন শেষে আমার কানে ফিরে এল, তখন হয়ে গেছে 'হ্যাংলা কানে হাতি হাসে।' দশ বারোজন লোক হলে খেলাটা আরো বেশি জমে।

হাজারিবাগের পরে গিয়েছি দ্বারভাঙ্গা, আর তারও পরে আরা। এই দুটো জায়গাই হাজারিবাগের তুলনায় কিছুই না, কিন্তু তাতে ফুর্তিতে কোনো কমতি হয়নি। ইতিমধ্যে নিনি রুবির আরেক খুড়তুতো বোন ডলি এসে খেলার সাথী আরেকজন বেড়ে গেছে।

দ্বারভাঙ্গাতে প্রকান্ড কম্পাউন্ডওয়ালা বাংলো টাইপের একতলা বাড়ি। কমপাউন্ডের একদিকে লম্বা লম্বা শিশুগাছ, আম গাছ আর আরো কত কী গাছ। বাড়ির বাঁ পাশে খোলা জায়গায় আরেকটা বড় আম গাছ। সেটা ছিল দোলনার গাছ।

আমরা যখন গিয়েছি তখন বর্ষাকাল। এক পশলা বৃষ্টির পর দোলনার গাছের তলার ঘাসবিহীন জমিতে সরু সরু খাল নালা দিয়ে বৃষ্টির জল বেগে গিয়ে পড়ত নর্দমায়। আমরা কাগজের নৌকো তৈরি করে নালার জলে ভাসিয়ে দিতাম। নালা এখন নদী; নৌকো নদীর স্রোতে ভেসে গিয়ে

পড়ত নর্দমার সমুদ্রে।

মাঝে মাঝে এই নৌকো হয়ে যেত ভাইকিং-এর নৌকো। হাজার বছর আগে নরওয়েতে জলদস্যু ছিল—তাদের বলা হত ভাইকিং। আমরা মনে করে নিতাম যে ভাইকিংদের মধ্যে কেউ জলপথে মারা গেলে তাকে নৌকোতেই দাহ করা হয়। আমরা কাগজের জলদস্যু তৈরি করে কাগজের নৌকোয় তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মুখে আগুন দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিতাম বৃষ্টির জলে। এটা ছিল 'ভাইকিংস ফিউনারেল।' অবিশ্যি ভাইকিং-এর সঙ্গে নৌকোও দাহ হয়ে যেত।

আরায় যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স নয়। লাল ইঁটের বিশাল বাড়ি পিসেমশাইয়ের। মাঝখানে উঠোন ঘিরে বেশ অনেকগুলি ঘর; যদ্দুর মনে পড়ে, তার কয়েকটা ব্যবহারই হত না। দোতলার ছাতের সঙ্গে কিছু ঘরও ছিল, তারই একটা ছিল পিসেমশাইয়ের কাজের ঘর। বাড়ির সঙ্গে মানানসই বাগানও ছিল।

কল্যাণদা যদিও আমার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়, সে তখন আমার বিশেষ বন্ধু। সে স্ট্যাম্প জমায়; তার দেখাদেখি আমিও জমানো শুরু করেছি, হিঞ্জ কিনেছি, টুইজার (চিমটে) কিনেছি, এমন কি একটা ম্যাগনি-ফাইং গ্লাসও জোগাড় করেছি স্ট্যাম্পে কোনো ছাপার ভুল আছে কিনা দেখার জন্য। ভুল থাকলেই সে টিকিটের দাম অনেক বেড়ে যায়। দিশি বিলিতি যে কোনো টিকিট হাতে পেলেই চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস। নাঃ—এটাতে ত কোনো ভুল নেই। এটাতেও না। কোনো টিকিটে কোনোদিনই ছাপার কোনো ভুল পাইনি। তাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে টিকিট জমানো ছেড়ে দিই।

কল্যাণদার আরেকটা ভূমিকা ছিল সেটা এখানে বলা দরকার।

ক্রিসমাস ব্যাপারটার উপর ছেলেবেলা থেকেই একটা টান ছিল সেটা আগেই বলেছি। ফাদার ক্রিসমাস বলে যে একটা বুড়ো দাড়িওয়ালা লোক আছে, আর সে যে ক্রিসমাসের আগের দিন রাত্তিরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ঘরে ঢুকে, খাটের রেলিং-এ ঝোলানো তাদের মোজাতে খেলনা ভরে দিয়ে যায়, এটা বোধহয় পুরোপুরি বিশ্বাস করতাম।

মেজোপিসিমার বাড়িতে যত ফুর্তি, তেমন ত আর কোথাও নেই। তাই সে ফুর্তি থেকে ক্রিসমাসটা বাদ পড়ে কেন? ডিসেম্বর মাসের দরকার কী? যে কোনো মাসেই ত হতে পারে ক্রিসমাস!

আরাতে তাই জুন মাসে কল্যাণদা হয়ে গেল ফাদার ক্রিসমাস। আমার খাটের রেলিং-এ মোজা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। রাত্তিরে আমি মট্‌কা মেরে পড়ে রইলাম বিছানায়। তুলো দিয়ে দাঁড়িগোঁফ করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে পরে নিল কল্যাণদা। পিঠে একটা থলি চাই, কারণ তাতে জিনিস থাকবে; আর ফাদার ক্রিসমাস যে আসছেন সেটা জানান দেওয়া চাই। তাই থলিতে অন্য জিনিসের সঙ্গে পুরে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু খালি টিনের কৌটো।

আধ ঘণ্টা খানেক চুপটি করে শুয়ে থাকার পর শব্দ পেলাম ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্।

একটু পরে আবছা অন্ধকারে আধ বোজা চোখে দেখলাম ফাদার-ক্রিসমাসবেশী কল্যাণদা থলি নিয়ে ঢুকল, খাটের রেলিং-এর পাশে এসে থামল, আর তার পরেই খুট্‌খাট শব্দে বুঝলাম আমার মোজার মধ্যে কী জানি পুরে দেওয়া হচ্ছে। সব ফাঁকি সেটা নিজেও জানি, কিন্তু তাও মজার শেষ নেই।

সেবার ধনদাদুও এসেছিলেন আরাতে আমরা থাকতে থাকতেই। আমরা ভাই বোনের দল সবাই বিকেলে বেড়াতে বেরোতাম দাদুর সঙ্গে। আরা স্টেশন ছিল আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক। আমরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সন্ধে হয় হয় সময়ে দেখতাম ইম্পিরিয়াল মেল আমাদের সামনে দিয়ে দশ দিক কাঁপিয়ে সিটি মারতে মারতে ছুটে বেরিয়ে গেল। এই জাঁদরেল ট্রেনের কামরার বাইরেটা ছিল হাল্‌কা হলদে রঙের; আর তার উপর ছিল সোনালী রঙের নকশা। আর কোনো ট্রেনের এত বাহার বা দাপট ছিল না।

একদিন সবাই যাচ্ছি স্টেশনের দিকে, দাদু সোলাটুপি ও হাতে লাঠি সমেত পুরোদস্তুর সাহেবী পোষাক পরে আমাদের সামনে সামনে চলেছেন। এমন সময় কোত্থেকে এক গরু শিঙ বাগিয়ে চোখ রাঙিয়ে ধেয়ে এল আমাদের দিকে। এমন হিংস্র গরু আর আমি দেখিনি কখনো। দাদু তক্ষুনি বললেন, 'তোমরা মাঠে নেমে যাও।'

মাঠে নামতে হলে যে ফণীমনসার বেড়া ভেদ করে যেতে হয় সে খেয়াল দাদুরও নেই, আমাদেরও নেই। মনসার ঝোপের মধ্যে দিয়েই মাঠে গিয়ে নামলাম। হাতে পায়ে কাঁটার আঁচড়ে জখমটা যে কতদূর হয়েছে সেটা সে অবস্থায় বুঝতেই পারিনি। আমরা ঝোপের ফাঁক দিয়ে দম বন্ধ করে দেখছি দাদু গরুর দিকে মুখ করে দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা এরো-

প্লেনের প্রপেলারের মতো বন বন করে ঘোরাচ্ছেন, আর গরুটাও শিঙ বাগিয়ে হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত মানুষটার অদ্ভুত কান্ড দেখে থমকে গেছে।
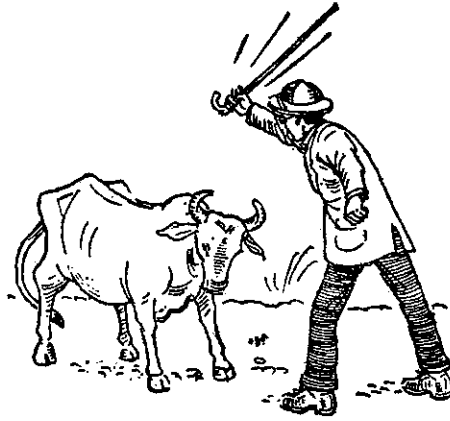
দাদুর এই তেজ পাগলা গরু মিনিট খানেকের বেশি সহ্য করতে পারেনি।

গরু হটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও সাহস পেয়ে সাবধানে বাড়তি জখম বাঁচিয়ে বেরিয়ে এলাম ঝোপের পেছন থেকে।

সেই বারই পরের দিকে আরাতে আরেকটা বড় দল গিয়ে হাজির হয়েছিল। এরা ছিল আমার ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়ের আট ছেলেমেয়ের মধ্যে জনা চারেক। আমরা যখন ভবানীপুরে ছোটদাদুও তখন রিটায়ার করে ভবানীপুরেই থাকেন, চন্দ্রমাধব ঘোষ রোডে। ছোটদাদু সরকারী জরিপ বিভাগে কাজ করতেন, আর সেই কাজ তাঁকে নিয়ে যেত আসাম-বর্মার দুর্গম জঙ্গলে পাহাড়ে। আমি অবিশ্যি ছোটদাদুকে ভালো ভাবে চিনি তিনি চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে। নিজে দারুণ শক্ত মানুষ ছিলেন বলেই বোধহয় শরীর চর্চার দিকে ভয়ানক দৃষ্টি দিতেন। কাউকে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখলেই পিঠে মারতেন এক খোঁচা। এনার প্রাণখোলা অট্টহাসির শব্দ রাস্তার এমোড় থেকে ওমোড় শোনা যেত, আর ইনি এক-রকম ভাবে শিস দিতে পারতেন, যেটা পাড়ার সব লোকের পিলে চমকে দিত।

কাকা পিসীদের মধ্যে সকলেই পড়াশুনায় ভীষণ ভালো ছিল। তিন বোনের মধ্যে মেজো লীলুপিসীকে (যিনি এখন সন্দেশের একজন সম্পাদিকা) তখন চিনতাম আঁকিয়ে হিসেবে। এক ভাই কল্যাণ চুপচাপ মানুষ, ভোর চারটেয় ঘুম থেকে ওঠে, আর রাত্তিরে বাইশটা হাতে গড়া রুটি খায়। পরের ভাই অমির ছিল দুর্দান্ত স্ট্যাম্পের কালেকশন; সরোজ ছিল তখন রায় পরিবারের সবচেয়ে লম্বা মানুষ; ছোট যতু নিজের চেহারা সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সচেতন, কাছে আয়না পেলে একবার আড়চোখে নিজেকে দেখে নেবার লোভ সামলাতে পারে না।

সবচেয়ে বড় ভাই প্রভাতকাকার অঙ্কের মাথা দুর্দান্ত আর তার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তার একটা কারণ এই যে ছোটকাকার মতো প্রভাতকাকারও অভ্যাস ছিল আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসা। এই কাজটা অনেক সময়ই তিনি হেঁটে করতেন; ছ'সাত মাইল হাঁটাটা প্রভাতকাকার কাছে কিছুই ছিল না; আমাদের বাড়িতেও আসতেন মাঝে মাঝে, আর টার্জানের গল্প পড়ে বাংলা করে শোনাতেন। আমাকে প্রভাতকাকা ডাকতেন খুড়ো বলে।

চতুর্থ ভাই সরোজ তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে একটা নতুন স্কুল থেকে, আর ছোট যতু তখনও সেই স্কুলে পড়ে। আট বছর বয়স অবধি আমি মা'র কাছে বাড়িতেই পড়েছি; নতুন স্কুলটা ভালো শুনে মা ঠিক করলেন আমাকে ওখানেই ভর্তি করবেন।

স্কুলের কথায় পরে আসছি, কিন্তু একটা কথা এইবেলা বলে রাখি—ছুটি জিনিসটা যে কী, আর তার মজাটাই বা কী, সেটা স্কুলে ভর্তি হবার আগে জানা যায় না। এক তো রবিবার আর নানান পরবের ছুটি আছে, তাছাড়া আছে গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটি। এই দুটো বড় ছুটি আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মনটা খুশির সুরে বাঁধা হয়ে যেতো। ছুটির মধ্যে কলকাতায় পড়ে আছি, এ জিনিস তখন কমই হত।

খুব বেশি করে মনে পড়ে দুটো ছুটির কথা।

একবার আমাদের বাড়ির লোক, লখ্‌নৌয়ের মেজোমামা-মামী আর মামাতো ভাইয়েরা, আমার ছোটকাকা আর আরো কয়েকজন আত্মীয়স্বজন মিলে এক বিরাট দল গেলাম হাজারিবাগে। Kismet নামে এক বাংলো ভাড়া করে ছিলাম আমরা। খাবার-দাবার টাট্‌কা ও সস্তা, চমৎকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। ক্যানারি হিলের চূড়োয় ওঠা, রাজরাপ্পায় পিকনিক, বোখারো

জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া—সব মিলিয়ে যেন সোনায় মোড়া দিনগুলো। সন্ধ্যাবেলা পেট্রোম্যাক্সের আলোয় দল করে নানান রেশারেশির খেলা। সবচেয়ে আমোদের খেলা ছিল Charade। এ খেলার বাংলা নাম আছে কিনা জানি না, তবে এটা জানি যে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়িতেও এ খেলার চল ছিল। দু' দলে ভাগ করে খেলতে হয়—পালা করে এক দল অভিনেতা, এক দল দর্শক। যারা অভিনয় করবে তারা এমন একটা কথা বেছে নেবে যেটা দুটো বা তারও বেশি কথার সমষ্টি। যেমন করতাল (কর+তাল), সন্দেশ (সন+দেশ), সংযমশীল (সং+যম+শিল); সংযমশীল কথাটা যদি বেছে থাকে অভিনয়ের দল, তাহলে তাদের পর পর চারটে ছোট ছোট দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে হবে দর্শকের দলকে। প্রথম দৃশ্যে 'সং', দ্বিতীয় দৃশ্যে 'যম' আর তৃতীয় দৃশ্যে 'শিল' কথাটা বুঝিয়ে সব শেষে পুরো কথাটা অভিনয় করে বোঝাতে হবে। দুরকম Charade হয়—Dumb Charade আর Talking Charade। যদি Dumb Charade খেলা হয়, তাহলে শুধু মূকাভিনয় করে কথাগুলো বোঝাতে হবে। আর যদি Talking Charade হয় তাহলে অভিনেতাদের কথাবার্তার মধ্যে এক আধবার বাছাই করা কথাগুলো ঢুকিয়ে দিতে হবে। দর্শকের দলকে চারটে দৃশ্যের অভিনয় দেখে পুরো কথাটা বার করতে হবে। বড় দল হলেই খেলাটা জমে ভালো। আমরা ছিলাম প্রায় দশ-বারো জন। সন্ধেটা যে কোথা দিয়ে কেটে যেত তা টেরই পেতাম না।

আরেকটা স্মরণীয় ছুটি কেটেছিল স্টিম লঞ্চে করে সুন্দরবন সফরে। আমার এক মেসোমশাই ছিলেন একসাইজ কমিশনার। তাঁকে সুন্দরবনে কাজে যেতে হত মাঝে মাঝে। একবার তিনি বেশ কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিলেন, তার মধ্যে আমি আর মাও ছিলাম। মাসি আর মেসো ছাড়া ছিলেন চার মাসতুতো দিদি আর রণজিৎদা। রণজিৎদা বা 'রণদা' ছিলেন শিকারী; সঙ্গে নিয়েছিলেন বন্দুক আর অজস্র টোটা। মাতলা নদী ধরে যেতে হবে আমাদের একেবারে মোহানা পর্যন্ত, আর তারই ফাঁকে সুন্দরবনের খাল বিলের মধ্যে দিয়ে ঘুরবে আমাদের লঞ্চ। সবশুদ্ধ পনের দিনের ব্যাপার।

সফরের বেশির ভাগটা সময়ই ডেকে বসে দৃশ্য দেখে কেটেছে। মাতলা বিশাল চওড়া নদী, প্রায় এপার ওপার দেখা যায় না। সারেঙরা মাঝে মাঝে জলে বালতি নামিয়ে দেয়, আর তুললে পরে দেখা যায় জলের সঙ্গে উঠে

এসেছে প্রায়-স্বচ্ছ জেলিফিশ। যখন খালের ভিতরে ঢোকে লঞ্চ তখন দৃশ্য যায় একেবারে বদলে। দূর থেকে দেখছি খালের পারে সার সার কুমীর রোদ পোহাচ্ছে, তার পিঠে বক বসে আছে দিব্যি, আর কাছে এলেই কুমীরগুলো সড়াৎ সড়াৎ করে নেমে যায় জলে। যেদিকে কুমীর সেদিকে জঙ্গল পাতলা, বেশির ভাগ গাছই বেঁটে, আর অপর পারে বিশাল বিশাল গাছের গভীর জঙ্গল, তার মধ্যে হরিণের পাল চোখে পড়ে। তারাও লঞ্চের শব্দ শুনলেই ছুট লাগায়।

একদিন আমরা লঞ্চ থেকে নেমে নৌকো করে ডাঙায় গিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চললাম এক আদ্যিকালের পোড়ো কালী মন্দির দেখতে। মাটি ফুঁড়ে বল্লমের মতো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে একরকম শেকড়, হাতে লাঠিতে ভর করে তার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে এগোতে হয়। সঙ্গে বন্দুকধারী আছেন দুজন, কারণ এই তল্লাটেই বাঘের আস্তানা, বাবাজী কখন দেখা দেন তা বলা যায় না।

বাঘ আমরা দেখিনি এ যাত্রায়, কিন্তু শিকারী রণদা একটা কুমীর মেরেছিলেন। এক জায়গায় খালের ধারে ডাঙায় কুমীরের প্রাচুর্য দেখে লঞ্চ থামানো হল। রণদা নৌকো করে চলে গেলেন সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা দম বন্ধ করে বসে থাকার পর একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। লঞ্চ থেকে বেশ দূরে চলে যেতে হয়েছিল শিকারীর দলকে।

আরো আধ ঘণ্টা পরে নৌকো ফিরল এক কুমীরের লাশ সঙ্গে নিয়ে। সে কুমীরের ছাল ছাড়ানো হল লঞ্চের নিচের ডেকে। সে ছাল দিয়ে রণদা সুটকেস বানিয়েছিলেন।

সাত দিনের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম টাইগার পয়েণ্ট। সামনে অগাধ সমুদ্র, বাঁয়ে ছোট্ট একটা দ্বীপ, আর তার উপরে বালির পাহাড়। আমরা ঢেউবিহীন সমুদ্রের জলে স্নান করে বালির পাহাড়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম আমাদের লঞ্চে। লোকালয় থেকে যে বহুদূরে চলে এসেছি সেটা আর বলে দিতে হয় না। নির্ভেজাল আনন্দের কথা বলতে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে সুন্দরবন সফরের এই ক'টা দিনের স্মৃতি আমার মনে অনেকটা জায়গা দখল করে রয়েছে।
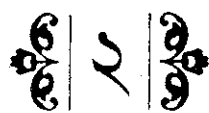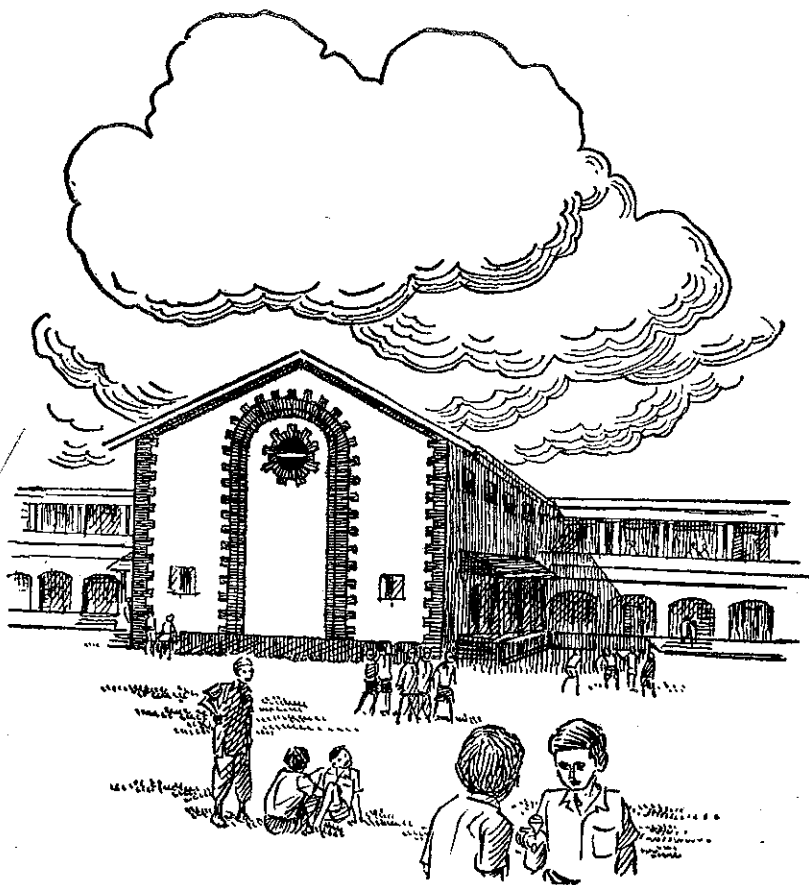
বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল

ইস্কুলে

ছেলেবেলা কখন শেষ হয়? অন্যদের কথা জানি না, আমার মনে আছে যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে এসে টেবিলের উপর থেকে মেক্যানিক্সের বইটা তুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছিল আমি আর ছোট নেই, এর পর কলেজ, এখন থেকে আমি বড় হয়ে গেছি।

তাই আমি আমার ইস্কুল জীবনের কথা দিয়েই আমার ছেলেবেলার কথা শেষ করব।

আমি যখন ইস্কুলে ভর্তি হই তখন আমার বয়স সাড়ে আট। মামা-বাড়িতে তখন আরেকটি মামা এসে ডেরা বেঁধেছেন। এঁর নাম লেবু। এঁর কথা আগেই বলেছি। একদিন সকালে লেবুমামার সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে। যে ক্লাসে ভর্তি হব—ফিফ্‌থ ক্লাস (পরে নাম হয়েছিল ক্লাস সিক্স)—সেই ক্লাসের মাস্টার আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে দিলেন, আর গোটা চারেক অঙ্ক কষতে দিলেন। আমি অন্য একটা ঘরে বসে উত্তর লিখে আবার মাস্টারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। মাস্টার তখন ইংরিজির ক্লাস নিচ্ছেন। আমার উত্তরের দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। তার মানে উত্তরে ভুল নেই। আর তার মানে আমার ইস্কুলে ভর্তি হওয়া হয়ে গেল।

কাঠের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে মাস্টারের হাত থেকে খাতা ফেরত নিচ্ছি, এমন সময় ক্লাসের একটি ছেলে (পরে জেনেছিলাম তার নাম রাণা) গলা তুলে আমাকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী ভাই?' আমি বললাম আমার নাম।—'আর ডাকনাম?' জিগ্যেস করল মিচকে শয়তান রাণা দাশ। আমার কোনো ধারণা নেই যে ইস্কুলে চট্ করে নিজের ডাকনাম বলতে নেই। আমি তাই সরল মনে ডাকনামটা বলে দিলাম।

সেই থেকে আমার ক্লাসের বা ইস্কুলের কোনো ছেলে আমাকে ভালো

নাম ধরে ডাকেনি। সে নামটা ব্যবহার করতেন শুধু মাস্টারমশায়রা।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলটা ছিল ল্যানসডাউন রোড পেরিয়ে বেলতলা রোড পুলিশ থানার পূব গায়ে। স্কুলের পুবে যে রাস্তা, তার ওপারে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ। সেখান থেকে বছরে একবার করে বি. টি-র ছাত্ররা এসে আমাদের ক্লাস নিত।

উঁচু পাঁচিলে ঘেরা ইস্কুলের দক্ষিণ অংশটা খেলার মাঠ। আকাশ থেকে দেখলে ইস্কুলের বাড়িটাকে দেখাবে ইংরেজি T অক্ষরের মতো। তলার ঝুলে থাকা অংশটা হল ইস্কুলের হলঘর আর মাথার লম্বা অংশটা ক্লাস-রুমের সারি। গেট দিয়ে ঢুকে ডাইনে দারোয়ানের ঘর, বাঁয়ে একটু গেলেই একটা বট গাছ। তার গুঁড়িটাকে ঘিরে একটা সিমেন্ট বাঁধানো বেদি। গাছের নিচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাস নেই, কারণ সেখানে টিফিন টাইমে মার্বেল খেলে ছেলেরা। খেলার মধ্যে বড় মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি সবই হয়। আর বছরে একদিন হয় স্পোর্টস। এছাড়া মার্বেল, ডাংগুলি, হাডুডু, লাট্টুর খেলা ইত্যাদি ত আছেই।

দারোয়ানের ঘর পেরিয়ে মোরাম বিছানো পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে তিনধাপ সিঁড়ি উঠে পুব-পশ্চিমে টানা ইস্কুলের বারান্দা। বারান্দার ডাইনে সারবাঁধা ক্লাসরুম আর বাঁয়ে অর্ধেক পথ গিয়ে হলঘরের দরজা। গ্যালারি-ওয়ালা হলঘরে সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হল বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী। এছাড়া সরস্বতী পুজোয় পাত পেড়ে খাওয়া হয়, মাঝে মাঝে বক্তৃতা হয়, আর একবার মনে আছে গ্রীনবার্গ অ্যান্ড সেলিম বলে দুই বিদেশী অভিনেতা এসে সেক্সপিয়রের মার্চেন্ট অফ ভেনিস থেকে কয়েকটা দৃশ্য অভিনয় করেছিল। আমরা সবাই ফোল্ডিং চেয়ারে বসে জীবনে প্রথম সেক্সপিয়র দেখছি, আর আমাদের কাছেই দাঁড়িয়ে ইংরিজির মাস্টার ব্রজেনবাবু চোখ বড় বড় করে স্টেজের দিকে চেয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়ে চলেছেন—বোধ হয় যাচাই করে দেখছেন ছাত্র জীবনে পড়া নাটকটার কতখানি মনে আছে। একবার, বোধ হয় সরস্বতী পুজোর দিনেই, আমাদের হলে চার্লি চ্যাপলিনের ছবি দেখান হল। শো যে হবে, তার নোটিস আগের দিন দারোয়ান এসে আমাদের ক্লাসে আহ্মেদ স্যারের হাতে তুলে দিল। আহ্মেদ স্যার পড়লেন, 'থ্রু দ্য কাইন্ড কার্টসি অফ মেসারস্ কোদক কোম্পানি—' ইত্যাদি। কোড্যাক কোম্পানির নাম স্যারের জানা নেই, তিনি ভাবলেন নামটা দিশি, মোদকের জাতভাই-টাই হবে আর কি!

বারান্দার শেষ মাথায় পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে নামলেই সামনে দেখা যায় ছাউনির তলায় দুটো পাশাপাশি জল খাবার ট্যাঙ্ক। ঘাড় নিচু করে কল খুলে আঁজলা করে জল খেতে হয়। ট্যাঙ্ক দুটোর ওপারে পশ্চিমের দেওয়ালের লাগোয়া হল কার্পেন্টি্র ক্লাস, যেখানে তরফদার স্যারের আধিপত্য। হাতুড়ি, বাটালি, রেঁদা, করাত, ফ্রেটওয়র্ক মেশিন কোনটারই অভাব নেই সেখানে, আর সব সময়ই ক্লাসের ভিতর থেকে নানারকম যান্ত্রিক শব্দ শোনা যায়।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই দেখা যায় বারান্দার রেলিং-এর উপর ঝুলছে স্কুলের ঘণ্টা। দারোয়ান ছাড়া এই ঘণ্টা বাজায় কার সাধ্য। দড়ি ধরে ঘণ্টায় কাঠি মারলে ঘণ্টা ঘুরে যায়—একটার বেশি ঢং বেরোয় না ঘণ্টা থেকে। দারোয়ান যে কি করে ম্যানেজ করে সেটা আমাদের সকলের কাছেই রহস্য।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁয়ে ঘুরলে আপিস ঘর পেরিয়ে হেডমাস্টারমশায়ের ঘর। আপিসে একটি আলমারি ভরতি বই। সেটাই হল স্কুলের লাইব্রেরি। বইয়ের মধ্যে তিনটে—সিন্ধবাদ, হাতেমতাই আর দাগোবার্ট—এত পপুলার যে হাত ঘুরে ঘুরে তাদের অবস্থা শোচনীয়। তিনটে একই সিরিজের বই। সিন্ধবাদ ত সবাই জানে, আর হাতেমতাই-এর নাম এখনো মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিন্তু দাগোবার্টের নাম ইস্কুল ছাড়ার পরে আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

ইস্কুলের দপ্তরীর কাজও এই আপিস ঘরেই। গোল ডান্ডার মতো রুলার গড়িয়ে গড়িয়ে খাতায় লাল নীল কালি দিয়ে সমান্তরাল লাইন টানা দেখতে ভারী অদ্ভুত লাগত সেটা এখনো মনে আছে।

সিঁড়ি উঠে ডাইনে গেলে প্রথমে পড়বে মাস্টারমশাইদের কমনরুম, তারপর সারবাঁধা ক্লাসরুম। একতলা দোতলা মিলিয়ে সবশুদ্ধ আটটা ক্লাস —থ্রী থেকে টেন। প্রত্যেক ক্লাসে দুজন পাশাপাশি বসার ষোলটা করে ডেস্ক, কোনো ক্লাসেই ত্রিশ বত্রিশ জনের বেশি ছাত্র নেই। দশটায় ইস্কুল বসে। একটায় এক ঘণ্টা টিফিনের ছুটি, তারপর চারটে পর্যন্ত ক্লাস। গ্রীষ্মের ছুটির পর মাসখানেক মর্নিং স্কুল। সকাল সাতটায় ক্লাস বসে। উত্তরায়ণের রোদ তখন জানালা দিয়ে ক্লাসে ঢুকে ক্লাসের চেহারা একেবারে পালটে দেয়। মাস্টারমশাইদেরও কেন জানি সকালে কম ভীতিজনক বলে মনে হয়। সূর্য মাথার উপর উঠলেই বোধ হয় মানুষের মেজাজটা আরো তিরিক্ষি হয়ে যায়। মর্নিং স্কুলটা তাই অনেক বেশি স্নিগ্ধ বলে মনে হত।

অবিশ্যি এ থেকে যদি মনে হয় যে মাস্টারমশাইদের বেশির ভাগেরই মেজাজ তিরিক্ষি ছিল, সেটা কিন্তু ঠিক হবে না। বরং এটাই ঠিক যে কিছু বাছাই করা দুষ্টু ছেলেদের উপর কিছু মাস্টারের রাগ গিয়ে পড়ত মাঝে-মধ্যে। মাস্টার বুঝে এবং অপরাধ বুঝে শাস্তিরও রদবদল হত। কিল, চড়, কানমলা, ঝুলপি ধরে উপরে টান, বেঞ্চে দাঁড়ানো, কান ধরে এক পায়ে দাঁড়ানো—সব রকমই দেখেছি আমরা। তবে আমি নিজে কোনোদিন এসব ভোগ করেছি বলে মনে পড়ে না। ভালো ছেলে, শান্ত শিষ্ট (কেউ কেউ জুড়ে দিত 'লেজ বিশিষ্ট') ছেলে হিসেবে গোড়া থেকেই একটা পরিচয় তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার।

আমি ছ'বছর ইস্কুল জীবনে দুজন হেডমাস্টারকে পেয়েছিলাম। প্রথম যখন ভর্তি হই তখন ছিলেন নগেন মজুমদার। তোমরা সন্দেশে ননীগোপাল মজুমদারের গল্প পাও মাঝে মাঝে; নগেনবাবু ছিলেন ননী-গোপালের বাবা। তিনি যে হেডমাস্টার সেটা আর বলে দিতে হত না। অন্তত আমার কল্পনার হেডমাস্টারের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল ষোল আনা। মাঝারি হাইট, ফরসা রঙ, ঝুপো সাদা গোঁফ, সাদা চুল, পরনে গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্ট। মেজাজ যে শুধু গম্ভীর তা নয়, স্কুলে তাঁর মুখে কেউ কোনদিন হাসি দেখেছে কিনা সন্দেহ। বছরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষার পর একটা বিশেষ দিনে তিনি প্রত্যেকটি ক্লাসে গিয়ে হাতের লিস্ট দেখে পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় কে হয়েছে সে নামগুলো পড়ে শোনাতেন। ক্লাসের বাইরে 'নগা'-র জুতোর আওয়াজ পেলেই বুকের

ভেতর যে ধড়ফড়ানি শুরু হত তার কথা কোনোদিন ভুলব না।

নগেনবাবুর পরে এলেন যোগেশবাবু, যোগেশচন্দ্র দত্ত। এঁর চেহারা নগেনবাবুর চেয়ে কিছুটা চিমড়ে আর গোঁফটা ঠোঁটের নিচে অনেকটা কম জায়গা দখল করে; কিন্তু ইনিও মার্কা-মারা হেডমাস্টার। এঁর প্যান্টটা ছিল ঢোলা গোছের। তখন আমরা ক্লাসে রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প পড়ছি; তাতে একরকম প্যান্টের কথা আছে যার নাম গ্যালিগ্যাসকিন্‌স। তিন চারশো বছর আগে আমেরিকায় এই প্যান্ট চালু ছিল। এই গাল ভরা নামওয়ালা প্যান্টটি যে আসলে কিরকম দেখতে সেটা আমাদের কারুরই জানা নেই, কিন্তু আমরা ঠিক করে নিলাম যে ওটা যোগেশবাবুর ঢোলা প্যান্টের মতোই হবে। তাই যোগেশবাবুর প্যান্ট তখন থেকে আমাদের কাছে হয়ে গেল গ্যালিগ্যাসকিন্‌স।

এই যোগেশবাবুর নাম যে কেন 'গাঁজা' হল সেটার কারণ আর এখন মনে নেই। হয়ত যোগেশ থেকে যগা থেকে গজা থেকে গাঁজা। তবে এনার সম্বন্ধে আমাদের ভীতি খানিকটা কেটে গিয়েছিল যখন একদিন ইনি আমাদের একটা ক্লাস নিলেন। কোনো একজন মাস্টারমশাই অনুপস্থিত ছিলেন, তাই এই ব্যবস্থা। আশ্চর্য, সেদিনের ক্লাসে যতটা মজা পেয়েছিলাম, যত নতুন জিনিস শিখেছিলাম, সেরকম আর কখনো হয়নি। 'গেঞ্জি কথাটা কোথা থেকে এসেছে সে বলতে পারে?' এই ছিল যোগেশবাবুর প্রথম প্রশ্ন। আমরা কেউই বলতে পারলাম না। যোগেশবাবু বললেন, 'কথাটা আসলে ইংরিজি—Guernsey। ইংলিশ চ্যানেলে ফ্রান্সের উপকূলের কাছাকাছি একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম Guernsey। সেখান থেকেই এই জামার নাম, যেটা ওদের দেখে খালাসীরা পরত।'

যোগেশবাবু আরো বললেন যে বাঙালীরা এককালে এক ধরনের ওভার-কোট পরত যাকে তাঁরা বলতেন অলেস্টার। এই কোটের আসল নাম নাকি Ulster, আর এ নামটাও এসেছে একটা জায়গার নাম থেকে। আয়ারল্যাণ্ডের আলস্টার নামে একটি শহরে এই কোট প্রথম চালু হয়।

এর পরে যোগেশবাবু যেটা করলেন সেটা আমাদের বেশ তাক লাগিয়ে দিল। ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে উনি প্রথমে লিখলেন—

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়

তারপর প্রত্যেকটা কথা থেকে খানিকটা অংশ মুছে দিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল—

এই ঘটনার পরে গাঁজা হয়ে গেলেন আমাদের বেশ কাছের মানুষ।

হেডমাস্টারমশাইয়ের পরেই যাঁকে সবচেয়ে বেশি সমীহ করতাম তিনি হলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। এঁকে আমরা লাহিড়ী স্যার বা জ্যোতির্ময়বাবু না বলে সব সময়েই মিস্টার লাহিড়ী বলতাম, তার কারণ মাস্টারমশাইদের মধ্যে এনার মতো সাহেব আর কেউ ছিলেন না। লম্বা সুপুরুষ চেহারা, গায়ের রঙ ধপধপে, দাড়ি গোঁফ কামানো, পরনে সুট আর টাই। সুটের কোটটা একটু বেঁটে, এছাড়া খুঁত ধরার জো নেই। হলঘরে কোনো অনুষ্ঠান হলে ইনি দাঁড়িয়ে থাকতেন হাত দুটো পেটের উপর জড়ো করে। হাততালির প্রয়োজন হলে দুটো হাত উঠত না কখনো; একটা হাত পেটের উপরেই থাকত, অন্যটা তার পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করত।

মিঃ লাহিড়ীর ইংরিজি উচ্চারণ ছিল সাহেবের মতো। ওয়লটর স্কটের আইভান হো পড়ানোর সময় স্কটের ফরাসী নামগুলোর উচ্চারণ শুনে ভক্তি একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। Front-de-Boeuf-এর উচ্চারণ যে ফ্রঁদ্ব্যো হতে পারে সেটা কে জানত?

যোগেশবাবুর পরে ইনিই হেডমাস্টার হয়েছিলেন; কিন্তু ততদিনে আমার ইস্কুলের পাট শেষ হয়ে গেছে।

অন্য মাস্টারমশাইদের মধ্যে এক-একজন এক-একটি টাইপ। তখন বৃটিশ আমল। সরকারী ইস্কুলের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দু মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কিছু মুসলমান ও কিছু বাঙালী ক্রিশ্চান থাকাটা ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন আহমেদ স্যার, জসীমউদ্দীন আহ্মেদ, যিনি কোড্যাককে বলেছিলেন কোদক। এছাড়া আরো দুজন আমাদের পড়িয়ে গেছেন, তার মধ্যে একজন হলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। ইনি বছর খানেক আমাদের বাংলা পড়ালেন। এঁর একটি কবিতা আমাদের পাঠ্যের মধ্যে ছিল,

যার প্রথম দু লাইন হল—

আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে...

মোস্তাফা সাহেব পূর্ব বঙ্গের লোক, 'চ' আর 'ছ'-কে ইংরিজি এস্‌-এর মতো উচ্চারণ করেন। ভারী দরদের সঙ্গে কবিতাটি পড়লেন তিনি, কিন্তু উচ্চারণ শুনে কিছু ত্যাঁদড় ছেলে বুঝে নিল এঁকে নিয়ে একটু রগড় করা যায়। গোপাল আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এই যে স্‌সোটো গলিতে স্‌সোটো মেয়ে দেখার কথা লিখেছেন, এটা স্‌সোত্যি ঘটনা স্যার?'

মোস্তাফা সাহেব সরল মানুষ, বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি। সত্যিই আমি একদিন গলি দিয়ে যেতে যেতে দেখি একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার মাথায় টুক করে একটা টোকা মেরে দিলাম।'

'টোকা মারলেন স্যার? বাঃ!'

কথা আর বেশি এগোলো না, কারণ পিছন থেকে 'অ্যাই গোপ্‌লা, বোস্‌' বলে চাপা ফিসফিসে রব উঠেছে।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে ক্রিশ্চান ছিলেন দুজন—বি. ডি. স্যার আর মনোজবাবু। বি. ডি. স্যার অর্থাৎ বি. ডি. রায়। পুরো নাম বোধহয় বিভূদান কি বিধুদান। এমন নাম এর আগে বা পরে কখনো শুনিনি। ইনি পড়াতেন ইংরিজি। ছোটখাটো মানুষ, ইংরিজি উচ্চারণ যাতে ঠিক হয় সেদিকে বিশেষ নজর। ঈশপের গল্প The Ox and the Frog পড়বার আগে বলে নিলেন, 'ভাওয়েলের আগে The-এর উচ্চারণ হবে দি, আর কনসোনেণ্টের আগে দ্য। দি অক্স অ্যান্ড দ্য ফ্রগ। আর ইংরিজি দ-এর উচ্চারণ বাংলা দ-এর মতো নয়। বাংলা দ বলার সময় জিভ আর টাকরার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না, কিন্তু ইংরিজির সময় সামান্য ফাঁক থাকবে, যাতে খানিকটা হাওয়া বেরোয়। আসলে ইংরিজি দ-এর উচ্চারণ দ আর Z-এর মাঝামাঝি।'

মনোজবাবুর এক ভাই পুলিশে কাজ করেন। তাঁর বাসস্থান ছিল আমাদের ইস্কুলের লাগোয়া থানায়। এই পুলিশ ভাইয়ের দুই ছেলে সুকুমার ও শিশির পড়ত আমাদের ক্লাসে। এরা ইস্কুলে আসত পাঁচিল টপকে। সুকুমার আমাদের ক্লাসের সেরা দৌড়বাজ, দুবার পর পর হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডসে জিতেছে। শিশিরটা মিচকে, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিল

চড় কানমলা তার দৈনিক বরাদ্দ, বিশেষ করে তার কাকার হাতে। মনোজবাবু পড়ানোর সময় চেয়ারে প্রায় বসেন না বললেই চলে; টেবিলে ঠেস দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে হাতে বই নিয়ে ক্লাস নেন। একটা অদ্ভুত মুদ্রাদোষ —মাঝে মাঝে ডান কাঁধটা ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে আর ঘাড়টা ডাইনে হেলে পড়ে, যেন মাছি তাড়াচ্ছেন। আর প্রচণ্ড অন্যমনস্ক। কখন যে কিসের কথা ভাবেন সে এক রহস্য। তার উপর ঠোঁটের ডগায় লেগে আছে 'ভেরি গুড'।—'একটু বাইরে যাব স্যার?' 'ভেরি গুড।' আমরা চুপ। বাইরে যাবার মধ্যে ভেরি গুডের কী আছে? পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'এই ত গেলি বাইরে, আবার কেন?'

হেড পণ্ডিতমশাই ভটচায্যি স্যারের কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তাঁর হাতের লেখার জন্য। ব্ল্যাকবোর্ডে এত সুন্দর বাংলা লেখা আর কেউ লিখতে পারে বলে মনে হয় না।

সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাইকে কেন যে সবাই ভ্যান পণ্ডিত বলত তার কারণ কোনোদিন জানতে পারিনি। নামকরণটা হয়ে গিয়েছিল আমি আসার আগেই। এঁকেও কোনোদিন হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে গোমড়া মেজাজ হওয়া সত্ত্বেও, উনি ছাত্রদের সামলানোর ব্যাপারে তেমন দুরস্ত ছিলেন না। এনার একটা ধমক এখনো কানে লেগে রয়েছে—'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা দিয়ে রক্তের গঙ্গা বয়ে গেল, তাও তোমরা মনোযোগ দিচ্ছ না?'

এনার হাত যে চলত খুব বেশি তা নয়, কিন্তু একবার অজয়কে কানের পাশে চড় মেরে প্রায় অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। সেদিন সারা ইস্কুল সরগরম। টিফিনের আগের ক্লাসে ঘটনাটা ঘটেছে, টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেছে, কিন্তু ক্লাস থেকে কেউ বেরোয়নি। অজয় মুখ লাল করে হাত দিয়ে কান ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছে, ছেলেরা তাকে ঘিরে রয়েছে, পণ্ডিতমশাইকেও একরকম ক্লাসেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে ক্লাসরুমের বন্ধ দরজার খড়খড়ি ফাঁক করে অন্য ক্লাসের ছেলেরা 'ভ্যান! ভ্যান!' করে টিটকিরি দিচ্ছে।

প্রহার ছাড়া আরেক রকমের অস্ত্র কোনো কোনো মাস্টারমশাই ব্যবহার করতেন যেটা প্রহারেরও বাড়া। সেটা হল বাক্যবাণ। রমণীবাবু ছিলেন এ ব্যাপারে অদ্বিতীয়। তাঁর দাঁতখিঁচুনো চেহারাটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জন্য সব সময় তৈরী হয়ে থাকত। সঞ্জয় বলে একটি নতুন ছেলে ভর্তি হল—

তখন আমরা বোধহয় ক্লাস এইটে। জানা গেল ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। ছেলেরা মস্করার এ সুযোগ ছাড়বে কেন? আমার বেলাতেও ছাড়েনি। আমি যে সুকুমার রায়ের ছেলে আর উপেন্দ্রকিশোরের নাতি এটা গোড়াতেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তারপর ক্রমে বেরিয়ে পড়ল এইচ. এম. ভি-র আর্টিস্ট কনক দাশ আমার মাসি আর বাংলার সেরা ক্রিকেটার কার্তিক বোস আমার কাকা। এর কয়েকদিন বাদে আমাকে শুনতে হল, 'হ্যাঁরে মানিক, অমল বলছিল পঞ্চম জর্জ নাকি তোর দাদু; সত্যি নাকি?' সেইরকম 'রবিবাবু তোর কে হন রে? জ্যাঠামশাই?'—এ প্রশ্ন সঞ্জয়কে অনেকবার শুনতে হয়েছে। দোষের মধ্যে সঞ্জয়ের রংটা শুধু উগ্র রকম ফরসা নয়, তার সঙ্গে বেশ খানিকটা গোলাপীর ছোপ। যাকে বলে দুধে আলতা। তা ছাড়া ঠাকুরবাড়ির মেধার অংশও যে তার ভাগে খুব বেশি পড়েনি সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল। রমণীবাবু সেটা আঁচ করে নিয়ে তার দিকে ছাড়লেন বাক্যবাণ—'এই যে মাকাল ফল, মাকাল ঠাকুর—তোমার কান দুটো আরেকটু লাল করে দেব নাকি, অ্যাঁ? এস ত কাছে বাপু!'

রমণীবাবুর এই ছ্যাঁকা দেওয়া কথা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের কারুরই ছিল না। কিন্তু এমন মাস্টারমশাইও ছিলেন যাঁদের রাগ যাতে বেশিদূর এগোতে না পারে তার ব্যবস্থা করা ছাত্রদের অসাধ্য ছিল না। ব্রজেনবাবু ছিলেন আমাদের প্রিয় মাস্টারমশাইদের মধ্যে একজন। কড়া কথা তার মুখ দিয়ে খুব বেশি শোনা যায়নি। ছাত্রেরা বেশি গোলমাল করলে তিনি ভারী ব্যস্ত হয়ে বলতেন, 'Cease talking! Cease talking!' তাতে সব সময় যে খুব কাজ হত তা নয়। একবার এই অবস্থায় আর থাকতে না পেরে ব্রজেনবাবু একজন ছাত্রের দিকে চেয়ে হাঁকলেন, 'অ্যাই, তুই উঠে আয় এখানে।'

শাস্তিটা কী হবে জানা নেই; হয়ত ক্লাসরুমের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হবে। ছাত্রটি উঠে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ অলোক তার জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে ব্রজেনবাবুকে জড়িয়ে ধরল।

'স্যার, আজকের দিনটা ওকে মাপ করে দিন স্যার!'

ব্রজেনবাবুর রাগ তখনো পড়েনি, তবে তিনি এই অপ্রত্যাশিত বাধাতে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'কেন, আজকের দিনটা কেন?'

'আজ মার্চেণ্ট সেঞ্চুরি করেছে স্যার!'

এই ব্রজেনবাবুরই একদিন সরকারী ডাক পড়ল এক বিখ্যাত খুনের

মামলায় জুরি হবার জন্য। এ ডাকে সারা না দিয়ে উপায় নেই; ব্রজেনবাবুকে তাই মাঝে মাঝে ইস্কুল কামাই করে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। পাকুড় হত্যার মামলায় তখন কলকাতা সরগরম। জমিদারী খুনে মামলা, সেই নিয়ে কত বই বেরোচ্ছে হপ্তায় হপ্তায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রী হয় সেগুলো আর লোকে হুমড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে গোগ্রাসে গেলে। ব্রজেনবাবু কোর্টে হাজিরা দিয়ে পরদিন স্কুলে এলেই আমরা তাঁকে ছেঁকে ধরি—'স্যার, মামলায় কী হল বলুন স্যার!' পড়াশুনা শিকেয় ওঠে, কারণ ব্রজেনবাবুও যেন গল্প শোনাতে উৎসুক। টানা এক ঘণ্টা ধরে হাওড়া স্টেশনের ভীড়ের মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার লোকহর্ষক হত্যার গল্প শুনি আমরা।

বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুলে তখনকার দিনে ছাত্রদের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। আমরা কেউ কেউ হাফপ্যাণ্ট পরতাম, কেউ কেউ ধুতি। মুসলমান ছেলেদের পায়জামা পরেও আসতে দেখেছি মনে পড়ে। ধুতির সঙ্গে সার্ট পরাই ছিল রেওয়াজ, আর একটু লায়েক ছেলে হলেই সার্টের পিছনের কলারটা দিত তুলে। স্পোর্টসম্যান হলে ত কথাই নেই। উঁচু ক্লাসের কেষ্টদা, যতীশদা, হিমাংশুদা, এঁরা সকলেই খেলোয়াড় ছিলেন, আর সকলেই কলার তুলতেন। এর মধ্যে কেষ্টদার রীতিমতো দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল ম্যাট্রিক ক্লাসেই; দেখে মনে হত বয়স অন্তত উনিশ কুড়ি ত হবেই। আমরা মাত্র চার ক্লাস নিচে পড়েও অনেক বেশি ছেলেমানুষ, দাড়ি গোঁফের কোনো লক্ষণ ত নেই-ই—অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না।

কলার তোলার যিনি রাজা, তিনি কিন্তু ছাত্র নন, তিনি শিক্ষক। ড্রিল স্যার সনৎবাবু। ইনি যখন এলেন তখন ইস্কুলে তিন বছর হয়ে গেছে আমার। চোখ ঢুলুঢুলু বায়স্কোপের হিরো হিরো চেহারা, আর সার্টের কলার এত বড় আর ছড়ানো যে কাঁধ অবধি পেঁৗছে যায়। তার উপর সেটা তুললে মনে হল ড্রিল স্যার বুঝি ওড়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এখন যেটাকে পি. টি. বলা হয়, তখন সেটাই ছিল ড্রিল। সপ্তাহে দুটো কি তিনটে দিন একটা ঘণ্টা ইস্কুলের মাঠে কাটাতে হত। ড্রিল স্যারের তখন মিলিটারি মেজাজ। নানারকম কুচকাওয়াজের মধ্যে হাই জাম্পেরও ব্যবস্থা আছে। মাটি থেকে হাত দুয়েক উঁচুতে শুইয়ে রাখা বাঁশ টপকে পেরোতে হবে। যে ইতস্তত করবে তারই প্রতি হুঙ্কার ছাড়বেন ড্রিল স্যার—'আই সে জাঁ—প!' ভদ্রলোক Jump কথাটা জাম্প আর ঝাঁপের মাঝামাঝি করে
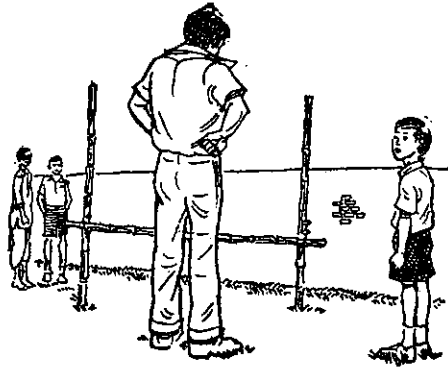
নিয়েছেন হুকুমটা আরো জোরদার হবে বলে। এই জাঁপের হুকুম আমাকেও শুনতে হয়েছে, কারণ ছেলেবেলায় ডেংগু নামে এক বিটকেল অসুখে আমার ডান পা-টা কমজোর হয়ে যাবার ফলে আমি লম্ফঝম্পে কোনদিনই বিশেষ পারদর্শী হতে পারিনি।

যে জিনিসটা ছেলেবয়স থেকে বেশ ভালোই পারতাম সেটা হল ছবি আঁকা। সেই কারণে ইস্কুলে ঢোকার অল্পদিনের মধ্যেই আমি ড্রইং মাস্টার আশুবাবুর প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলাম। 'সইত্যাজিত নামেও সইত্যাজিত কাজেও সইত্যাজিত' কথাটা অনেকবার বলতে শুনেছি আশুবাবুকে, যদিও কাজেও সত্যজিৎ বলতে উনি কী বোঝাতে চান সেটা বুঝতে পারিনি। রোগা পটকা মানুষ, চোখা নাক, সরু গোঁফ, হাতের আঙুলগুলো সরু লম্বা, টাক মাথার পিছন দিকে তেলতেলে লম্বা চুল। গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে আঁকা শিখেছেন, তবে ইংরিজিটা আদৌ শেখা হয়নি। ছাত্ররা সবাই সেটা জানে, আর জানে বলেই ক্লাসে নোটিস এলেই সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—'স্যার, নোটিস!' আশুবাবু দারোয়ানকে ঢুকতে দেখলেই একটা যে কোনো কাজ বেছে নিয়ে তাতে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করে বলেন, 'দিলীপ, নোটিশটা একটু পড়ে দাও ত বাবা!' দিলীপ ক্লাসের মনিটর। সে নোটিস পড়ে আশুবাবুর সমস্যা মিটিয়ে দেয়। একদিন আমার একটা ছবিতে আশুবাবু নম্বর দিলেন 10+F। সবাই ঝুঁকে পড়ে খাতা দেখে বলল, 'প্লাস এফ কেন স্যার?' আশুবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এফ হল ফার্স্ট।'

বাৎসরিক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের কিছুদিন আগে থেকে আশুবাবুর ব্যস্ততা বেড়ে যেত। হল সাজানোর ভার তাঁর উপর। ছেলেদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হবে সেটার দায়িত্বও তাঁর। প্রাইজের আগে বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা মার্কা মারা আইটেম আছে সেটাতেও আশুবাবুর অবদান আছে। আইটেমটাকে বলা হয় মিউজিক ড্রইং। এটা বোধ হয় স্কুলের শুরু থেকেই চালু ছিল। স্টেজের উপর ব্ল্যাকবোর্ড আর রঙীন চকখড়ি রাখা থাকবে। একজন ছাত্র একটি গান গাইবে, আর সেই সঙ্গে আরেকজন ছাত্র গানের সঙ্গে কথা মিলিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকবে। আমি থাকাকালীন প্রতি-বারই একই গান হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।' শেষের দু'-বছর বাদে প্রতিবারই একই আর্টিস্ট ছবি এঁকেছে—আমাদের চেয়ে তিন ক্লাস উপরের পড়ুয়া হরিপদদা। এটা বলতেই হবে যে হাত আর নার্ভ, এই দুটো জিনিসের উপরই আশ্চর্য দখল ছিল হরিপদদার। হল-ভর্তি লোকের সামনে নার্ভাস না হয়ে সটান ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকাটা চাট্টিখানি কথা নয়, কিন্তু হরিপদদা প্রতিবারই সে পরীক্ষায় চমৎকার ভাবে উৎরোতেন। ১৯৩৩-এ ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার কে নেবে তাঁর জায়গা ? আশুবাবুর ইচ্ছে আমি নিই, কিন্তু আমি আদৌ রাজী নই। এর সহজ কারণ হচ্ছে, আমার মতো স্টেজভীতি সচরাচর দেখা যায় না। কোনো বিষয়ে প্রাইজ পাচ্ছি শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, কারণ অতগুলো লোকের সামনে আমার নাম ডাক হবে, আমি জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে হোমরা-চোমরা কারুর হাত থেকে প্রাইজ নেবো, তারপর আবার হেঁটে আমার জায়গায় ফিরে আসব, এটা আমার কাছে একটা আতঙ্কের ব্যাপার। কাজেই মিউজিক ড্রইং-এর ভার শেষ পর্যন্ত পড়ল সুরঞ্জনের উপর। ছবি একইঃ নদীতে সাদা পাল তোলা নৌকো, আকাশে থোকা থোকা সাদা মেঘ, মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ওপারের গাছপালার পিছন দিয়ে—কিন্তু হরিপদদার পারিপাট্য আর হাতের জোর নেই।

অনুষ্ঠানের সূচীর মধ্যে আমি থাকার শেষ তিন বছর দুটি জিনিস কখনো বাদ পড়েনি। এক হল মাস্টার ফুলুর তবলা, আরেক হল জয়ন্তীর ম্যাজিক। ফুলু আমাদের চেয়ে ক্লাস তিনেক নিচে পড়ত। ৭ বছর বয়স থেকে তবলা বাজায়। পরে আরেকটু বড় হয়ে আসর-টাসরেও বাজিয়েছিল। জয়ন্ত আমার চেয়ে দু'ক্লাস উপরে পড়ত, পর পর দুবার ফেল করে আমাদের

ক্লাসে এসে যায়। পরীক্ষায় যে সে পাশ করবে না সেটা বুঝেছিলাম যখন সে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরাও লক্ষ করছিলাম সে খাতার দিকে না চেয়ে বার বার নিজের কোলের দিকে চাইছে। কোলে বই খোলা আছে কি? যে মাস্টারমশাই গার্ড দিচ্ছিলেন তিনিও ব্যাপারটা দেখে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলেন জয়ন্তর দিকে।—'নিচে কী দেখা হচ্ছে?' জয়ন্ত হাত তুলে দেখিয়ে দিল তাতে একটি আস্ত মর্তমান কলা।—'টিফিনে খাব স্যার। তাই দেখে নিচ্ছিলাম ঠিক আছে কিনা।'

জয়ন্ত ম্যাজিক অভ্যাস করছে দশ-এগার বছর বয়স থেকে। স্টেজের ম্যাজিক ছাড়াও আরো ভেলকি জানে সে। আমাদের ক্লাসে আসার কয়েক-দিনের মধ্যেই দেখি ক্লাসে বসে বসেই পরিমল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কী ব্যাপার?—না, জয়ন্ত কয়েক মিনিট ধরে পরিমলের গলার দুদিকের দুটো রগ টিপে ধরে বসে ছিল। তার থেকেই এই কাণ্ড। জয়ন্ত বুঝিয়ে দিল ওই দুটো রগকে বলে carotid arteries। ওগুলো টিপে রাখলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কমিয়ে দিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করে দেয়। তবে রগ ছেড়ে দেবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়ে যায়, আর জ্ঞান ফিরে আসে।

হাত সাফাই-এর ম্যাজিকে জয়ন্ত ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে সে যে আরো অনেক বেশি অগ্রসর হচ্ছে সেটা জেনেছিলাম আমাদেরই ক্লাসের অসিতের জন্মদিনের নেমন্তন্নে। অসিত জয়ন্তকে ডেকেছিল ম্যাজিক দেখানর

জন্যই। খাওয়ার পর ম্যাজিক হবে, খাওয়ার মধ্যে কাচের জলের গেলাস হাতে নিয়ে জল খেয়ে হঠাৎ গেলাসটাকেই কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিল জয়ন্ত। কাচ খাওয়া, পেরেক খাওয়া, এ সবই স্কুলে থাকতেই শিখেছিল। স্কুল ছাড়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই শুনলাম অ্যাসিড খেয়ে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে জয়ন্ত মারা গেছে।

আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনিলের কথাটা আলাদা করে বলা দরকার, কারণ তার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। অনিল খুব অল্প বয়সে বেশ কিছুদিন সুইজারল্যান্ডে ছিল একটা কঠিন ব্যারাম সারানোর জন্য। সেরে উঠে দেশে ফিরে ১৯৩৩-এ ভর্তি হয় আমাদের ক্লাসে। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। সঞ্জয়ের যেমন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, অনিলেরও পূর্বপুরুষের মধ্যে একজন বিখ্যাত বাঙালী ছিলেন। একবার বি. টি.-র এক ছাত্র আমাদের ক্লাস নিচ্ছেন, রোমান ইতিহাস পড়াতে গিয়ে এট্রুরিয়ার রাজা লার্স পোরসিনার নাম উল্লেখ করামাত্র মিচ্‌কে ফরুরুখ বলে উঠেছে, 'কী বললেন স্যার, লর্ড সিন্‌হা?' পিছনেই বসেছিল অনিল। সে ফরুরুখের মাথায় মারল এক গাঁট্টা। কারণ আর কিছুই না, এই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন অনিলের দাদামশাই। অনিল নিজে ছাত্র ছিল খুব চতুর; বহুদিন বিদেশে থাকার জন্য বাঙলায় খুব কাঁচা, কিন্তু পুষিয়ে নিত ইংরিজি আর অঙ্কে। বাবার একমাত্র ছেলে আর অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে বলে অনিলের ভাগ্যে কিছু জিনিস জুটে যায় যেটা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। নেস্‌লে কোম্পানি তখন তাদের এক-আনার চকোলেটের প্যাকেটে এক ধরনের ছবি দিতে আরম্ভ করেছে। ছবিগুলো একটা সিরিজের অন্তর্গত, নাম ওয়ানডারস্‌ অফ দ্য ওয়ার্লড। নেস্‌লেই অ্যালবাম বার করেছে, সেই অ্যালবামে ছবিগুলো সেঁটে রাখতে হয়। আমাদের সকলের মধ্যে কম্পিটিশন লেগে গেল কার অ্যালবাম আগে ভরতি হয়। মুশকিল হচ্ছে কি, প্রত্যেক প্যাকেটেই যে নতুন ছবি পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। অনিলের পয়সা আছে, সে একসঙ্গে একশো প্যাকেট চকোলেট কিনে একদিনেই প্রায় অ্যালবাম ভরিয়ে নিল। ওর সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? অবিশ্যি যে ছবি একটার বেশি হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সে অন্যদের বিলিয়ে দিল অকাতরে, কিন্তু নিজে কিনে পাবার মতো মজা আছে কি তাতে? আমরা ডেস্কের মাঝখানে বসানো নীল কালির দোয়াতের মধ্যে রেড ইঙ্ক আর রিলিফ নিব ডুবিয়ে লিখি, আর অনিল লেখে পার্কার ফাউনটেন পেনে।
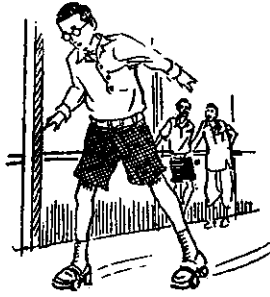
আমরা পাঁচ টাকার বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলি, অনিল হঠাৎ একদিন একটা পাঁচশো টাকার জার্মান লাইকা ক্যামেরা নিয়ে এল, সঙ্গে সাউথ ক্লাবের টেনিস টুর্নামেন্টের এনলার্জ করা ছবি। কলকাতায় যখন প্রথম ইয়ো ইয়ো বেরোল, অনিল এক সঙ্গে গোটা আষ্টেক কিনে নিয়ে এল ইস্কুলে। তারপর অবশ্য অনেকেই কিনল এই মজার খেলার জিনিসটা। একদিন ত দেখি অনিল এক জোড়া রোলার স্কেটস কিনে নিয়ে এসেছে। টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে চাকা লাগানো জুতো পরে বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা গড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

টিফিনের এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া এবং খেলা দুটোই চলত। অনেক ছেলে বাড়ি থেকে টিফিন বাক্সে খাবার নিয়ে আসত। আমরা খেতাম এক পয়সায় একটা করে আলুর দম। শালপাতার ঠোঙায় বিক্রী হত এই আলু, সঙ্গে একটি কাঠি, সেই কাঠিতে আলুটা বিঁধিয়ে মুখে পুরে দিতে হত। একদিন টিফিনের সময় দেখি অদ্ভুত এক নতুন খাবারের আমদানি হয়েছে। কাগজে মোড়া মাখনের প্যাকেটের মতো দেখতে আইসক্রীম—নাম 'হ্যাপি বয়'। বাঙালী কোম্পানি। রাস্তায় ফেরি করা আইসক্রীম সেই প্রথম। কিছুদিনের মধ্যেই শহরের সর্বত্র দেখা যেতে লাগল হ্যাপি বয় আইসক্রীমের ঠেলা গাড়ি। হ্যাপি বয় উঠে যাবার পর এল ম্যাগনোলিয়া, আর তারও অনেক পরে কোয়ালিটি-ফ্যারিনি।

টিফিন টাইমের খেলার মধ্যে গুলি-ডাংগুলি ছাড়া যেটা বিশেষভাবে চালু ছিল সেটা হল লাট্টু। যদুবাবুর বাজারের কাছে মিত্র মুখার্জির দোকানের সিঁড়িতে বিকেলে দোকান পেতে বসতেন কলকাতার সেরা লাট্টু বানানেওয়ালা গুপীবাবু। লাট্টু যে কত ভালো ঘুরতে পারে সেটা

গুপীবাবুর লাট্টুর ঘূর্ণি যে দেখেনি সে জানতে পারে না। সেই লাট্টু গচ্চা মেরে অন্যের লাট্টু ফাটিয়ে দেবার খেলা চলত টিফিনে। তাছাড়া হাত লেত্তি, উড়ন লেত্তি, ঘুরন্ত লাট্টুকে হাত থেকে লেত্তিতে ঢেলে নিয়ে আবার হাতে তুলে নেওয়া—এসব ত আছেই। একবার গচ্চা লাট্টুর গায়ে না লেগে লাগল অমলের পায়ে, আর পায়ের পাতা থেকে তৎক্ষণাৎ গলগলিয়ে রক্ত।

খেলতে গিয়ে এই ধরনের বিপত্তি আরো হয়েছে—যেমন হল অ্যানুয়্যাল স্পোর্টসে সুশান্তর। আমাদেরই ক্লাসের ছেলে, স্পোর্টস আর পড়াশুনা দুটোতেই ভালো। স্পোর্টসে একটা আইটেম ছিল ব্লাইন্ডফোল্ড রেস। মাঠের এক কোণ থেকে আরেক কোণে একশো গজ দৌড়ে আসতে হত চোখ বাঁধা অবস্থায়। রেস শুরু হল; সুশান্ত যে লাইন রাখতে পারেনি, মাঝপথে বাঁয়ে সরে এসেছে, সেটা দেখতেই পাচ্ছি। কে একজন তার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল তাকে সাবধান করে দেবার জন্য। সুশান্ত ভড়কে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থেমে পরমুহূর্তেই দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে গিয়ে ফিনিশিং পোস্ট থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত বাঁয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় সোজা ধাক্কা খেল ইস্কুল কম্পাউন্ডের দেয়ালে। সেই দৃশ্য, আর ধাক্কার সেই শব্দের কথা ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে। তার পরের বছর থেকে অবিশ্যি ব্লাইন্ডফোল্ড রেস ব্যাপারটাই উঠে যায়।

ইস্কুলের প্রথম চারটি বছর আমি বকুলবাগান রোডেই ছিলাম। ক্লাস নাইনে থাকতে সোনামামা বাড়ি বদল করে চলে গেলেন বেলতলা রোডে। এবাড়ি আগের বাড়ির চেয়ে কিছুটা বড়। বেলতলায় আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন চিত্তরঞ্জন দাশের জামাই ব্যারিস্টার সুধীর রায়। তাদের হাল্‌কা হলদে রঙের গাড়িই আমার প্রথম দেখা ডাকসাইটে জার্মান গাড়ি মার্সেডিজ বেন্‌ৎস। সুধীরবাবুর ছেলে মানু ও মণ্টু আমার বন্ধু হয়ে গেল। মানুও পরে ব্যারিস্টারি করে, আর আরো পরে রাজনীতি করে বাংলার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হয়। তখন লোকে তাকে জানে সিদ্ধার্থশংকর রায় নামে।

পাড়ায় একটা ছেলেদের ক্লাব আছে, আমি বেলতলা যাবার দু'এক-দিনের মধ্যে ক্লাবের ছেলেরা দল করে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। মানু-মণ্টুও সেই ক্লাবের সভ্য। আমাদের দুটো বাড়ি পরেই আরেক ব্যারিস্টার নিশীথ সেনের বাড়ি, সে বাড়ির বড় মাঠে ক্রিকেট হকি খেলা হয়, আর
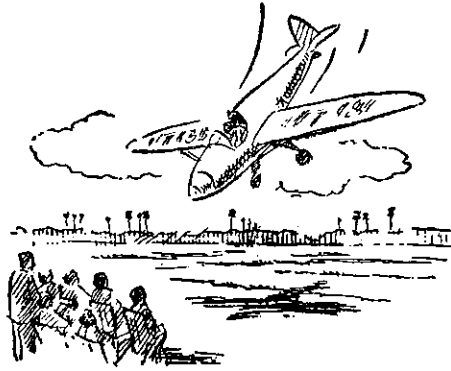
মানুদের ছোট মাঠে হয় ব্যাডমিনটন। নিশীথ সেনের ছেলে ভাইপো চুনি ফুনু অনু সবাই ক্লাবের মেম্বর। আরো মেম্বরদের মধ্যে আছে চাটুজ্যেদের বাড়ির নীলু, বলু, অনাথ, গোপাল। স্কুলে থাকতেই সঙ্গী-সাথী হয়েছিল—তারা বাড়ির বাইরে এসে রাস্তা থেকেই আমার ঘরের দিকে মুখ করে পাড়া কাঁপিয়ে হাঁক দিত—'মানিক, বাড়ি আছিস?' এখন তাদের সঙ্গে আরো নতুন সাথী যোগ হল।

আরেকটি ছেলে ছিল, সে সাউথ সুবারবন স্কুলে পড়ে আমাদের একই ক্লাসে, যদিও আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। পর পর কয়েক বছর ফেল করেই বোধহয় এই দশা। এই অরুণ, ডাকনাম পানু, হল ময়মনসিংহের অখিলবন্ধু গুহদের বাড়ির ছেলে; থাকে নিশীথ সেনের উল্টোদিকের বাড়িতে। আমাদের ক্লাবের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধি কম বলে তাকে বিশেষ কেউ পাত্তা দেয় না। সেই পানুও হঠাৎ একদিন দমদমের ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হয়ে এরোপ্লেন চালানো শিখে ফেলল। তারপর ফ্লাইং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সে আমাদের দমদমে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে টু-সীটার প্লেনে আকাশে উঠে পর পর ভীষণ শব্দে আমাদের দিকে ডাইভ করে নেমে এসে আবার উঠে গিয়ে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিল। এর পর থেকে অবিশ্যি আমরা পানুকে বেশ সমীহ করে চলতাম।

আমাদের সময় একটা সরকারী নিয়ম ছিল যে পনের বছর বয়সের কমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। আমাদের পরীক্ষা হবে ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে। তখন আমার বয়স হবে চোদ্দ বছর দশ মাস। তার মানে এক

বছর বসে থাকতে হবে। মহা মুশকিল। ওকালতির কারসাজির সাহায্যে বয়স বাড়িয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মা সে ব্যাপারে মোটেই রাজী নন। আশ্চর্য, পরীক্ষার কয়েক মাস আগেই সরকার পনের বছরের নিয়মটা তুলে দিলেন, আর আমাকেও এক বছর বসে থাকতে হল না।

ইস্কুল ছাড়ার বছর দশেক পরে কোনো একটা অনুষ্ঠানে, বোধহয় পুরোন ছাত্রদের সম্মেলনে—আমাকে বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে যেতে হয়েছিল। হলঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ ঘর কি সেই ঘর—যেটাকে এত পেল্লায় বলে মনে হত? দরজায় যে মাথা ঠেকে যায়! শুধু দরজা কেন, সবই যেন ছোট ছোট মনে হচ্ছে—বারান্দা, ক্লাসরুম, ক্লাসের বেঞ্চিগুলো।

অবিশ্যি হবে নাই বা কেন। যখন স্কুল ছেড়েছি তখন আমি ছিলাম পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর এবার যে ফিরে এলাম, এখন আমি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। স্কুল ত আছে যেই কে সেই, বেড়েছি শুধু আমিই।

এর পরে আর স্কুলে ফিরে যাইনি কখনো। এটাও জানি যে যে-সব জায়গার সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, সে সব জায়গায় নতুন করে গেলে পুরোন মজাগুলো আর ফিরে পাওয়া যায় না। আসল মজা হল স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে সেগুলোকে ফিরে পেতে।

—

পরিচয়লিপি

বাবা—সুকুমার রায়
মা—সুপ্রভা রায়
কাকীমা—পুষ্পলতা রায়
বুলুপিসি—মাধুরী মহলানবীশ
তুতুপিসি—ইলা চৌধুরী
সোনাঠাকুমা—মৃণালিনী বসু
হিতেনকাকা—হিতেন্দ্রমোহন বসু
বাপী—শৈলেন্দ্রমোহন বসু
বাবু—সোমেন্দ্রমোহন বসু
বুলাকাকা—প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ
সোনামামা—প্রশান্তকুমার দাশ
মেসোমশায়, ইনসিওরেন্স কম্পানির মালিক—অবিনাশচন্দ্র সেন
দিদিমা—সরলা দাশ
মেজোমামা—সুধীন্দ্রচন্দ্র দাশ
বড়মামা—চারুচন্দ্র দাশ
বড়মাসি—প্রতিভা দত্ত
মানুদা—দিলীপকুমার দত্ত
কালুমামা—বঙ্কিমচন্দ্র পাল

লেবুমামা—হীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মেজোপিসেমশাই—অরুণনাথ চক্রবর্তী
পানকুকাকা—করুণারঞ্জন রায়
নিনিদি—নলিনী দাশ
রুবিদি—কল্যাণী কার্লেকার
ছুটকিমাসি—প্রভা আয়েঙ্গার
মণ্টু—সঞ্জীবচন্দ্র দাশ
বাচ্চু—প্রতীপকুমার দাশ
পুপে—নন্দিনী দেবী
নন্দলালবাবু—নন্দলাল বসু
মায়ামাসিমা—মায়া দাশ
মনুমাসি—গিরিবালা সেন
মেজোপিসিমা—পুণ্যলতা চক্রবর্তী
কল্যাণ—কল্যাণকুমার চক্রবর্তী
লতু—ললিতা রায়
ডলি—অমিতা রায়
মেসোমশাই, একসাইজ কমিশনার —সুধীন্দ্রচন্দ্র হালদার
রণদা—রণজিৎ সেন
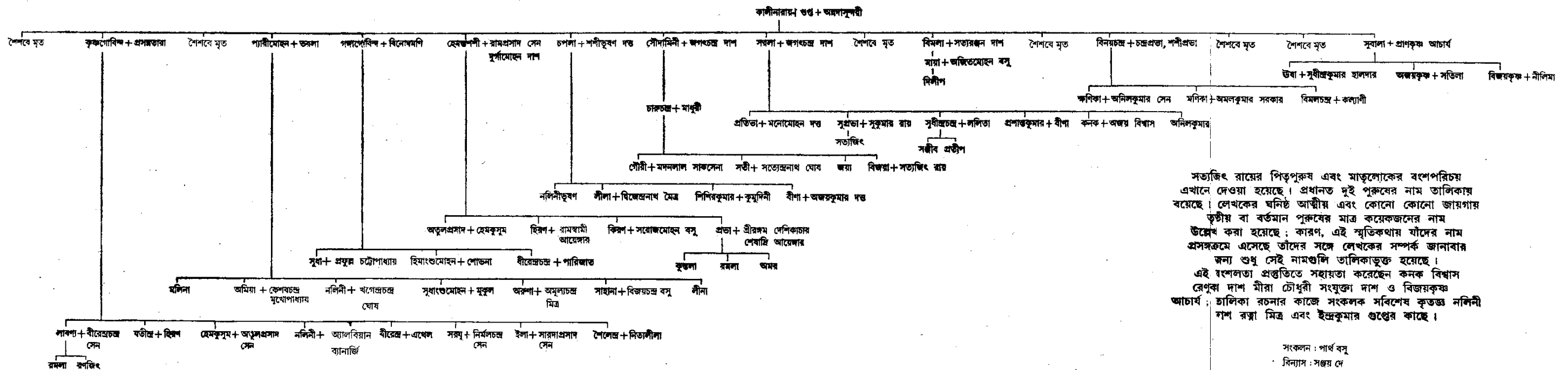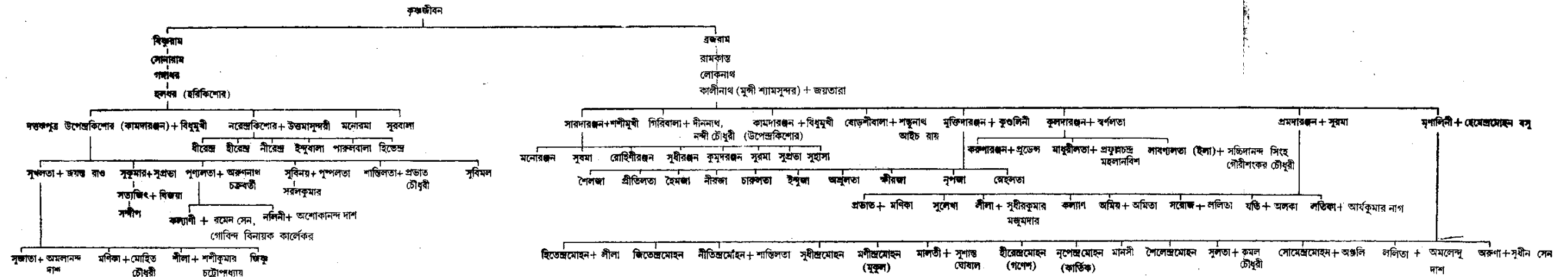
সত্যজিৎ রায়ের পিতৃপুরুষ এবং মাতুলোকের বংশপরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। প্রধানত দুই পুরুষের নাম তালিকায় রয়েছে। লেখকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং কোনো কোনো জায়গায় তৃতীয় বা বর্তমান পুরুষের মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ, এই স্মৃতিকথায় যাঁদের নাম প্রসঙ্গক্রমে এসেছে তাঁদের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক জানাবার জন্য শুধু সেই নামগুলি তালিকাভুক্ত হয়েছে।

এই বংশলতা প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন কনক বিশ্বাস রেণুকা দাশ মীরা চৌধুরী সংযুক্তা দাশ ও বিজয়কৃষ্ণ আচার্য; তালিকা রচনার কাজে সংকলক সবিশেষ কৃতজ্ঞ নলিনী দাশ রত্না মিত্র এবং ইন্দ্রকুমার গুপ্তের কাছে।

সংকলন : পার্থ বসু

বিন্যাস : সঞ্জয় দে

একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং

সত্যমেবজয়তে

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

সেই সত্য স্বরূপ মঙ্গল বিধাতাপরমেশ্বর, যিনি অখিল সংসারকে আপনার মঙ্গল-ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন; যিনি অতুল যত্নে ও স্নেহে, সকল জীবকে প্রতিপালন করিতেছেন, যিনি অনন্তকাল মানবাত্মার সহায় ও সঙ্গী হইয়া তাহাকে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আনন্দে বিভূষিত করিতে থাকবেন তিনি আজ এই নবকুমারের শুভ নামকরণ-অনুষ্ঠানে ইহার কল্যাণ বিধান করুন্।

অদ্য ব্রাহ্ম সংবৎ ৯৪ , খৃষ্টাব্দি ১৯২৩, বঙ্গাব্দ ১৩৩০, বৈশাখ মাসের ১৯শ দিবসে (২রা মে), বুধ বাসরে, কৃষ্ণ পক্ষে, দ্বিতীয়া তিথিতে সর্ব্বব্যাপী মঙ্গলময় পরমেশ্বর ও সমাগত বন্ধুগণের সমক্ষে কলিকাতা- পুরীবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা সুপ্রভা রায় চৌধুরীর প্রথম সন্তান শ্রীমান সত্যজিৎ রায় চৌধুরীর শুভ নামকরণ-কার্য্য দুই বৎসর বয়সে সম্পন্ন হইল। ঈশ্বর এই শিশুকে দীর্ঘায়ু করুন।

জাতাহ ১৮ই বৈশাখ (২রা মে) ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ, পূর্ব্বাহ্ণ ২টা ৪ মিনিটের সময় রবিবার* কৃষ্ণ পক্ষ নবমী তিথি। (*ইংরাজিমতে সোমবার)

জন্মস্থান--- কলিকাতা ১০০ নং গড়পার রোড ।

পিতাম	পিতামহী	মাতামহ	মাতামহী
৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	বিধুমুখী রায় চৌধুরী	৺কালীচন্দ্র দাস	সরলা দাস

পিতা
সুকুমার রায় চৌধুরী

মাতা
সুপ্রভা রায় চৌধুরী
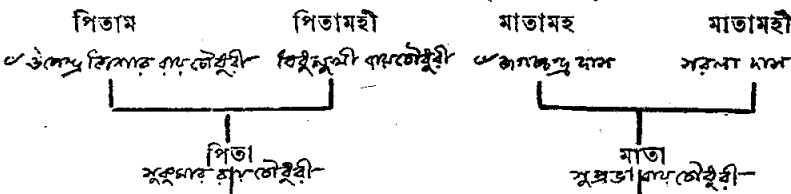
সন্তান
শ্রীমান সত্যজিৎ রায় চৌধুরী
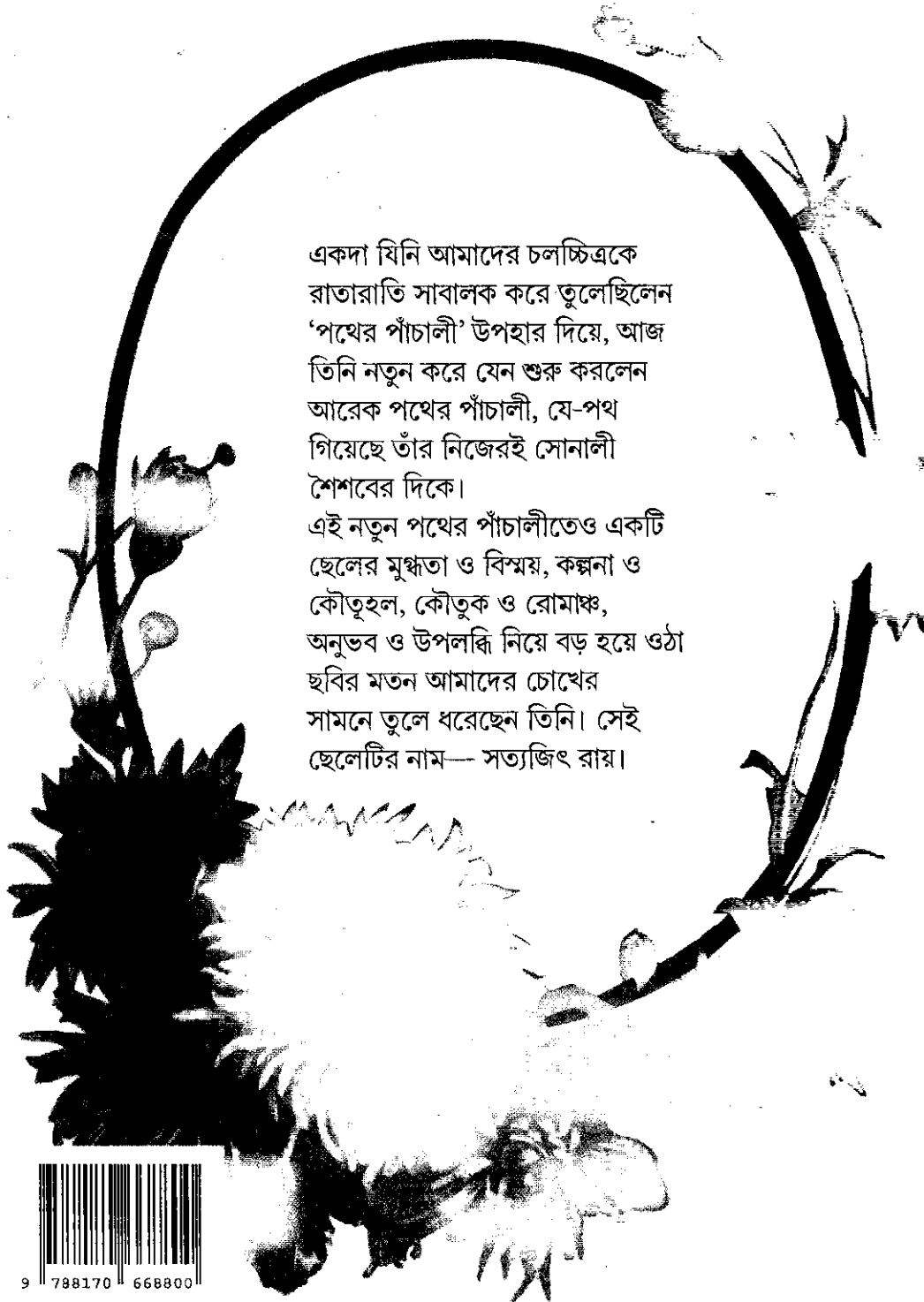
আমরা অদ্য শ্রীমান সত্যজিৎ রায় চৌধুরীর শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া ও কার্য্য সুসম্পন্ন হইল দেখিয়া, আনন্দিত হইলাম। করুণাময় পরমেশ্বর এই শিশুকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে নিরাপদে রক্ষা করুন্।

শ্রী [illegible] আচার্য্য [illegible] চট্টোপাধ্যায়
শ্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় শ্রী [illegible] ভট্টাচার্য্য

হে কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর। তোমার কৃপায় অদ্য আমাদিগের এই শিশু সন্তান শ্রীমান সত্যজিতের শুভ নামকরণ সম্পন্ন হইল। ইহার সুকুমার মস্তকে তোমার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর। তোমার প্রসাদে যেন এই শিশুর শরীর মন উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত হইয়া, ইহার জীবন-স্রোত তোমার পথে প্রবাহিত হয়। তুমি ইহার সহায় হইয়া ইহাকে রক্ষা কর। ইহার জনক জননী হইয়া তুমি ইহার জীবনে তোমার মহিমাকে মহীয়ান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

একদা যিনি আমাদের চলচ্চিত্রকে রাতারাতি সাবালক করে তুলেছিলেন 'পথের পাঁচালী' উপহার দিয়ে, আজ তিনি নতুন করে যেন শুরু করলেন আরেক পথের পাঁচালী, যে-পথ গিয়েছে তাঁর নিজেরই সোনালী শৈশবের দিকে।

এই নতুন পথের পাঁচালীতেও একটি ছেলের মুগ্ধতা ও বিস্ময়, কল্পনা ও কৌতূহল, কৌতুক ও রোমাঞ্চ, অনুভব ও উপলব্ধি নিয়ে বড় হয়ে ওঠা ছবির মতন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। সেই ছেলেটির নাম— সত্যজিৎ রায়।

9 788170 668800